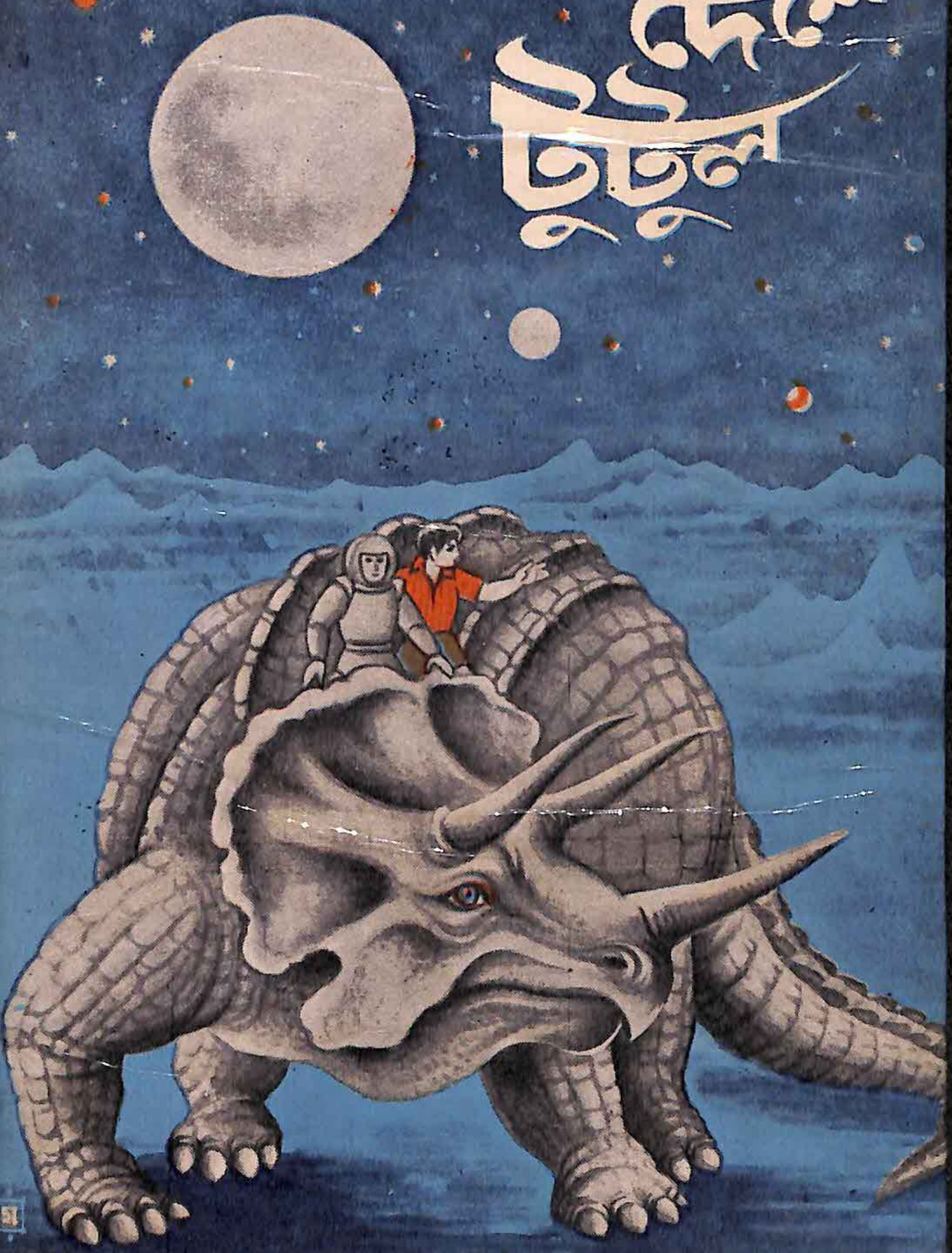
অরুণ দে

নক্ষত্রের দেশে টুটুল



নক্ষত্রের দেশে টুটুল

অরুণ দে

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম মুদ্রণ :
মাঘ, ১৩৯১

প্রকাশক :
শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ অলংকরণ :
গণেশ বসু

মূল্য : আট টাকা মাত্র

উৎসর্গ

মীরা দে-র

করকমলে

ভূমিকা

'নক্ষত্রের দেশে টুটুল' কয়েক বছর আগে 'শুকতারা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন অনেক পাঠক-পাঠিকা রচনাটি গ্রন্থাকারে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক বিমলারঞ্জনবাবুর প্রচেষ্টায় কাহিনীটি গ্রন্থ-রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

ধারাবাহিকভাবে কাহিনীটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময় যে সব পাঠক পাঠিকা আমাকে পত্র লিখে এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই সুযোগে তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৮/আর, বীরপাড়া লেন
কলিকাতা-৩০

অরুণ দে
১লা আশ্বিন, ১৩৯১



নক্ষত্রের দেশে টুটুল

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টুটুল।

নিজের চোখ দুটোকেই সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখের সামনে সে যা দেখছে, তা স্বপ্ন না সত্যি তা বুঝে ওঠার মত মানসিক অবস্থা সে বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

মাঝরাতে হঠাৎ কিসের শব্দে যেন তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিছানায় উঠে বসে সে খোলা জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে দূর আকাশের দিকে তাকায়। আকাশের গায়ে খুব বড় একটা জ্বলজ্বলে নক্ষত্র তার চোখে পড়ে। এ ধরনের নক্ষত্র সে আগে কখনও আকাশে দেখে নি।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তার মনে হয়, নক্ষত্রটা ক্রমশঃ তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। এতকাল সে দেখেছে নক্ষত্ররা আকাশের গায়ে স্থির হয়ে থাকে মিটমিট করে জ্বলে, কিন্তু কোন নক্ষত্র যে চলতে পারে তা তার জানা ছিল না।

প্রথমটা তার সন্দেহ হয়, সে বুঝি ভুল দেখছে, নক্ষত্র আকাশপথে এগিয়ে আসবে কি করে!

সন্দেহ দূর করার জন্য সে বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় আর অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, নক্ষত্রটা সত্যি তাদের বাড়ির ছাদের দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। উত্তেজনায় টুটুলের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বার কয়েক চোখ কচলে সে আবার চারদিকে ভাল করে তাকায়।

জানালার বাইরে বিরাট খোলা মাঠটায় তরল অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। মাঠের ওপারে বড় পাহাড় আবছা অন্ধকারে বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে।

চারদিক নিঝুম।

মা-বাবা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। টুটুলের সামনেই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। পড়াশুনা রাত জেগে করতে হবে বলে টুটুল ক'দিন ধরে একা এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেছে। আকাশের দিকে আবার তাকাল টুটুল।

সেই নক্ষত্রটার গতি বেড়ে গেছে। এতক্ষণ নক্ষত্রটা সোজা চলছিল। এখন পথ পরিবর্তন করে দ্রুতগতিতে পৃথিবীর দিকে নামছে। যতই এগোচ্ছে, নক্ষত্রটা ততই বড় হয়ে যাচ্ছে।

মাঠের ওপারে বিরাট পাহাড়টাই বুঝি নক্ষত্রের লক্ষ্যস্থল। তার উপর বুঝি সে নেমে পড়বে।

পাহাড়ের মাথার উপর বিরাট নক্ষত্রটাকে এবার অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নক্ষত্রটা নামছে হ্যাঁ ঠিক পাহাড়ের উপরেই নামছে।

টুটুল আর স্থির থাকতে পারল না। কি মনে করে তাড়াতড়ি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। সামনেই বিরাট মাঠ। মাঠ পেরিয়ে পাহাড়। টুটুল মাঠের মধ্য দিয়ে প্রাণপণে পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে সে লক্ষ্য করল, নক্ষত্র থেকে আলোর রেখা পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গমের ক্ষেতের উপর সেটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নক্ষত্র নয়, আসলে ওটা বোধহয় কোন আকাশ-যান। এরোপ্লেন যেমন লম্বা হয়, সে রকম নয়, অনেকটা গোল আকৃতির একটা অদ্ভুত যন্ত্র বা জিনিস। যন্ত্রটার সামনের দিকের বিরাট আলো যা অনেকটা মোটরগাড়ির হেড-লাইটের মত সেটাকেই এতক্ষণ নক্ষত্র বলে মনে হচ্ছিল।

এমন অবাক করা জিনিস এর আগে টুটুল কখনও দেখে নি।

ওটা কি? কেন পাহাড়ের কাছে এসে নামল, কিছুই সে ভেবে পেল না। তার কৌতূহল বেড়ে গেল। সে আরও জোরে ছুটে তাড়াতাড়ি জিনিসটার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করল।

কিন্তু সে আর বেশিদূর এগোতে পারল না। হঠাৎ সেই নক্ষত্রের আলো নিভে গেল। তার বদলে সেই অদ্ভুত জিনিসটার ভেতর থেকে একটা সবুজ আলোর রেখা বেরিয়ে এল। মনে হল কে যেন একটা বিরাট টর্চ লাইটের আলো জ্বেলেছে। সবুজ আলোর রেখা টুটুলের গায়ের উপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার দৌড়োন বন্ধ হয়ে গেল! তার মনে হল সে বুঝি একটা আলোর বৃত্তের মধ্যে আটকে গেছে।

চেষ্টা করেও সে আর হাত-পা নাড়তে পারল না। এগোতেও পারল না। সে চোখে দেখতে পাচ্ছে, তার নিঃশ্বাস পড়ছে কিন্তু নড়বার এতটুকু ক্ষমতা নেই। হঠাৎ সে যেন একটা ছবির মত হয়ে গেছে কিংবা মাঠের উপর দাঁড় করান একটা পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেছে। তফাৎ অবশ্য কিছু আছে। পাথরের মূর্তির প্রাণ থাকে না, তার প্রাণ আছে। চোখ দিয়ে সব কিছু দেখতেও পাচ্ছে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে স্থির, নিশ্চল।

সবুজ আলোর রেখা তার গায়ের উপর এসে পড়তেই কেন যে এমন হল তা সে কিছুই ভেবে পেল না।

একটু পরেই তার চোখে পড়ল সেই অদ্ভুত নক্ষত্র যন্ত্রটার ভিতর থেকে দুজন বেঁটে মানুষের মত দেখতে প্রাণী বেরিয়ে এল। বেঁটে মানুষদের পরিধানে ধূসর রঙের আঁটসাট পোশাক। তাদের শরীরের

প্রায় সমস্ত অংশই পোশাকে ঢাকা। শুধু হাত আর মুখ দেখা যাচ্ছে।

বেঁটে মানুষ দু'জন টুটুলের দিকে ছুটে এল। তাদের মধ্যে একজন কাছে এসে টুটুলের হাত চেপে ধরল।



তাদের মধ্যে একজন এসে টুটুলের হাত চেপে ধরল।

সবুজ আলোর রেখা, যা এতক্ষণ টুটুলকে ঘিরে রেখেছিল তা এবার নিভে গেল এবং অল্প দূরের সেই অদ্ভুত যন্ত্রটার সামনে নক্ষত্রের মত আলো আবার জ্বলে উঠল।

টুটুল অনুভব করল, এবার সে নড়তে পারছে। সে বেঁটে মানুষটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল।

সে অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল, লোকটা বেঁটে হলে কি হবে, তার গায়ে দারুণ শক্তি। খুব শক্ত মুঠিতে হাত চেপে ধরে রয়েছে। ছাড়ান অসম্ভব।

টুটুল চিরকালই সাহসী। বিপদে ঘাবড়ে যাবার ছেলে সে নয়।

সে চিৎকার করে বলল, তোমরা কে? আমার হাত ধরেছ কেন? ছাড়!”

উত্তরে বেঁটে লোক দুজন কি যেন বলল। তাদের গলার ভিতর থেকে ”ঘ-র-র-র টু-টু শব্দ বেরুল।

টুটুল ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারল না। লোক দুটো তাকে যে কিছু বোঝাতে চাইছে, এইটুকুই শুধু অনুমান করা গেল।

লোক দুটো ও বোধহয় বুঝতে পারল যে টুটুল তাদের কথা বুঝতে পারছে না। তখন তারা হাত নেড়ে টুটুলকে যে অদ্ভুত যন্ত্রটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেটা দেখাতে লাগল। ইঙ্গিতে বোঝাল যে তারা টুটুলকে যন্ত্রটার কাছে নিয়ে যেতে চায়।

নিরুপায় টুটুলকে বেঁটে লোক দুটো টেনে নিয়ে যন্ত্রটার কাছে যাবার জন্য পা বাড়াল। অবশ্য বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করতে হল না। যন্ত্রটাকে ভাল করে দেখার জন্য টুটুল খুবই কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল।

সে লোক দুজনের সঙ্গে যন্ত্রটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও একজন বেঁটে মানুষ তার হাত চেপে ধরে রয়েছে।

এতক্ষণে যন্ত্রটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল টুটুল।

যন্ত্রটা মাটি থেকে কয়েক ফিট উঁচুতে ভাসমান অবস্থায় স্থির হয়ে রয়েছে। তার ভিতরে লাল রঙের একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। মাঝখানে দরজার মত কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে।

সেই দরজা দিয়ে লোহার তৈরী মই-এর মত কি যেন বেরিয়ে এসে টুটুলের সামনে এসে মাটির উপর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মই-এ অনেকগুলি সিঁড়ি। মই-এর মুখটা যন্ত্রটার ভিতরেই রয়েছে।

এবার সেই বেঁটে লোক দু'জন টুটুলের দু' হাত ধরে তাকে মই-এর সিঁড়ির উপর ওঠার জন্য ইঙ্গিত করল।

টুটুল কি করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

সে এদিক ওদিক তাকাল। লোক দুজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার

দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর তাকে মইটা দেখিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলছে।

লোকগুলোর ইঙ্গিতে টুটুল মই-এর উপর উঠল। মই-এর সিঁড়িতে কয়েক পা উঠতেই মইটা নিজের থেকেই উপরের দিকে উঠে যন্ত্রটার ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল।

টুটুল ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, বেঁটে লোক দু'জনও মই-এর শেষ ধাপে ঝুলে পড়েছে। তারাও তার সঙ্গে মই সমেত উপরে উঠছে।

মইটা যন্ত্রের ভিতরে ঢুকে পড়তে টুটুল লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। লোক দু'জনও তার সঙ্গে যন্ত্রটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সামনেই সাজান-গোছান সুন্দর একটা ঘর। ঘরের এক কোণে একটা খাট। তার উপর বিছানা পাতা রয়েছে।

ঘরের দেওয়াল ইটের তৈরী নয়, মাটিরও নয়। বোধহয় পিতল বা ঐ জাতীয় কোন ধাতু দিয়ে তৈরী। দেওয়াল গুলো চিকচিক করছে। মাথার উপর দিকে অর্থাৎ সিলিং-এ একটা গোল বেগুনী আলো চক্রাকারে ঘুরছে।

বেঁটে লোকদের মধ্যে একজন ঘরে ঢুকেই দেওয়ালের একটা সুইচ টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মইটা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এমনভাবে বন্ধ হল যে ওখানে যে আগে কোন দরজা ছিল তা মনেই হচ্ছে না। যেন সবটাই একটা দেওয়াল মাত্র।

মাথার উপর বেগুনী আলোটা বন বন করে জোরে ঘুরতে লাগল আর সমস্ত যন্ত্রটা উপরের দিকে আকাশের মধ্যে দুরন্ত বেগে ছুটতে লাগল।

টুটুল বুঝতে পারল, সে পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক উপরে মেঘের রাজ্যে চলে যাচ্ছে।

বেঁটে লোকগুলো তাকে যন্ত্রটার ভিতরে বন্দী করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে!

সে খুব সাহসী কিন্তু এখন তার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল।

সে চিৎকার করে বেঁটে মানুষগুলোকে বলল, "তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে চল।"

বেঁটে লোকগুলো হাত তুলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল যে ভয় পাবার কিছু নেই।

টুটুল কিন্তু শান্ত হল না, সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমি তোমাদের সঙ্গে কোথাও যাব না। বাড়িতে আমার মা আছে। মা ঘুম থেকে উঠে আমাকে দেখতে না পেলে খুঁজবে। হয় তো কাঁদবে। আমি মাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরুই না। আমি মার কাছে যাব।"

লোকগুলো তার চিৎকার শুনে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করল, তার পর তাকে ধরে বিছানার উপর বসিয়ে দিল।

নরম গদির বিছানা। বেঁটে লোকেরা তাকে শুয়ে পড়তে ইঙ্গিত করল।

কিন্তু টুটুল শুল না। সে বলল, "তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ, বলছ না কেন? তোমরা কোন্ দেশের লোক? কেন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছ?"

বেঁটে লোকদের একজন ছুটে ঘরের দেওয়ালের কাছে গিয়ে একটা জায়গা টিপে ধরল। যেন কোন বোতাম টিপছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই দেওয়ালের কিছুটা জায়গা ফাঁক হয়ে গেল। ছোট একটা দরজা দেখা গেল। সেই দরজা দিয়ে বেঁটে লোকটা দ্রুতপায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

লোকটাকে টুটুল আর দেখতে পেল না, কিন্তু সে তার গলার শব্দ শুনতে পেল। মনে হল সে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে অন্য একজন বেঁটে লোককেও দেখা গেল। তার পোশাক অন্যরকম। তাকে টুটুল আগে দেখে নি।

কিছুক্ষণ পরে সেই নতুন বেঁটে লোকটা পৃথিবীর আর একজন

মানুষকে সঙ্গে নিয়ে টুটুলের ঘরে ঢুকল।

পৃথিবীর লোকটিকে দেখে টুটুল কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

তাদের স্কুলের বিজ্ঞানের মাস্টারমশায় রামকৃষ্ণবাবু তার দিকেই এগিয়ে আসছেন! দিন সাতেক আগে টুটুল স্কুলে গিয়ে শুনেছিল যে স্কুলের শিক্ষক রামকৃষ্ণবাবু নাকি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই রামকৃষ্ণবাবুকেই যে এই যন্ত্রটার মধ্যে আবার দেখতে পাবে তা টুটুল স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি।

উত্তেজনায় টুটুল বিছানা থেকে লাফিয়ে মেঝেয় নেমে পড়ে বলল 'স্যার, আপনি! এখানে! আপনি তো নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন শুনেছিলাম।"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "আমি নিরুদ্দেশ হই নি। এরাই—মানে এই উড়ন্ত যন্ত্রটার মধ্যে যাদের তুমি দেখছ—এরা আমাকে এক রাতে ধরে নিয়ে এসেছিল। সে সব কথা পরে হবে তোমার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি খুব ভয় পেয়েছ।"

টুটুল বলল, "স্যার, একটু ঘাবড়ে গেছি, এমন অবস্থায় এর আগে তো কখনও পড়ি নি। একটু ভয় ভয় করছে বটে, কিন্তু আপনাকে দেখে আবার সাহস ফিরে পেলাম।'

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "তুমি শান্ত হয়ে বোস। ভয় পাবার কিছু নেই। ক'দিন এদের সঙ্গে আছি, তাতে মনে হচ্ছে এরা যাই করুক, আমাদের মত মানুষের কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য এদের নেই। তবে··· রামকৃষ্ণবাবু আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন বেঁটে লোক একগ্লাস পানীয় ও ছানার মত কি একটা খাবার জিনিস একটা ট্রের উপর নিয়ে টুটুলের কাছে এগিয়ে গেল। ইঙ্গিতে টুটুলকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে বলল।

টুটুল গ্লাসের তরল পদার্থের দিকে তাকিয়ে খাবে কিনা ভাবছিল।

তাকে দ্বিধা গ্রস্ত দেখে রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "তুমি ওই ছানার মত জিনিসটা মুখে দিয়ে গ্লাসের শরবত খেয়ে নাও। আমি আগে এসব খেয়েছি। ছানার মত জিনিসটা বোধহয় কোন গাছের রস। পানীয় কি দিয়ে তৈরী তা বুঝতে পারি নি। তবে ও দুটো জিনিস খেলে দেহের শক্তি অনেক বেড়ে যায়, এটা অনুভব করেছি। মনও বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। খাও। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, খেয়ে নাও।"

রামকৃষ্ণবাবুর কথামত টুটুল খাবার ও পানীয় হাতে তুলে নিল।

মুখে দিয়ে মনে হল, এমন সুস্বাদু খাদ্য বা পানীয় এর আগে সে কখনও খায় নি।

একটু পরেই তার মনে হল, তার মনের ও দেহের শক্তিও বুঝি অনেকটা বেড়ে গেছে। টুটুলের খাওয়া শেষ হতেই তার ট্রেটা হাতে তুলে নিয়ে একজন বেঁটে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করে অন্য দু'জন ঘর থেকে চলে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে দুই ঘরের মধ্যের দরজাটা বন্ধ হয়ে ছিদ্রহীন বিরাট ধাতুনির্মিত দেওয়ালের রূপ নিল।

টুটুল বুঝতে পারল, এখন সে আর তার মাস্টারমশায় ছাড়া ঘরে কেউ নেই। বেঁটে মানুষের মত প্রাণীরা তাদের আলাদা ঘরে ছেড়ে দিয়ে কি উদ্দেশ্যে কোথায় গেল কে জানে?

রামকৃষ্ণবাবুকে সে প্রশ্ন করল, "স্যার, এই বেঁটে লোকগুলো কারা? এরা অনেকটা মানুষের মত দেখতে হলেও ঠিক যেন মানুষ নয়। এদের কি আপনি চেনেন?"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "না, চিনি না। তোমার মতই আমিও এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না! তবে মনে হয় অন্য কোন গ্রহের মানুষ।"

—অন্য গ্রহের? তার মানে?

—পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতে আরও অনেক গ্রহ উপগ্রহ আছে। বোধহয় এরা অন্য কোন গ্রহে বাস করে। সেখান থেকে পৃথিবীতে

নিজেদের উড়ন্ত যন্ত্রে এসেছিল।

—কিন্তু এরা আমাদের ধরল কেন? এরা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে?

—তা আমিও সঠিক জানি না। কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তা ওরাই বলতে পারবে। কিন্তু তা বোঝার জন্য ওদের ভাষা জানা দরকার—তা তো জানি না তাই কিছুই বুঝতে পারছি না।

—"স্যার, কোথায় যাচ্ছি তা হয়ত জানি না, কিন্তু এখন আমরা কোথায়? পৃথিবীর আকাশেই আছি তো?"

—"না। এই যন্ত্রটির গতি আলোর গতির থেকেও দ্রুত। পৃথিবী ছাড়িয়ে আমরা বোধহয় অনেক দূরে চলে এসেছি। আমি প্রথম দিন তোমার মত এই ঘরেই ছিলাম। এই ঘরের কোণে ছোট একটা জানলা আছে। সেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে তুমি হয়ত বুঝতে পারবে এখন আমরা কোথায় আছি।"

—"স্যার, আমাকে জানালাটার কাছে নিয়ে চলুন।"

—"বেশ, চল।"—বলে রামকৃষ্ণবাবু পা বাড়ালেন।

দু'জনে ঘরের কোণের জানালার কাছে পৌঁছল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল টুটুল।

অনন্ত নীল আকাশ। আশেপাশে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। আর তারার রাজ্যের মধ্য দিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে বেঁটে মানুষদের অদ্ভুত উড়ন্ত যন্ত্রটি। দূরে মহাশূন্যের মধ্যে উজ্জ্বল গোলাকার কি যেন ঝুলছে। সেদিকে তাকিয়ে টুটুল বলল, "স্যার—ঐগোল জিনিসটা কি? চাঁদ না সূর্য?"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "ওটা চাঁদ বা সূর্য নয়। লক্ষ্য করে দেখ, ঐ গোলাকার বস্তুর রঙ ঘন সবুজ। খুব সম্ভবতঃ ওটাই আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীকে মহাশূন্য থেকে সবুজ রঙেরই দেখায়। একটু ভাল করে খেয়াল করলেই দেখবে ঐ সবুজ গোল উজ্জ্বল জিনিসটা উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা। একেবারে গোল নয়। ওটা পৃথিবী

বলেই মনে হচ্ছে। এখন বোধহয় বুঝতে পারছ, পৃথিবী থেকে আমরা বহুদূরে চলে এসেছি।"

টুটুল অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। তার মনে হল, সে বুঝি নীল সমুদ্রের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মধ্যে যেমন ফসফরাস জ্বলে, তেমনই চারপাশে অগণিত তারা জ্বলছে। পৃথিবী থেকে বহুদূরে এ বুঝি কোন স্বপ্নে গড়া রাজ্য যেখানে মানুষ নেই, গাছপালা নেই, পাহাড় পর্বত কিছুই নেই। আছে শুধু অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র, অজানা গ্রহ উপগ্রহ আর সীমাহীন নীল আকাশ-সমুদ্র। এই অনন্ত আকাশ-সমুদ্র পেরিয়ে কোথায় যেতে হবে কে জানে?

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার ঘরের ভিতরে তাকাল টুটুল। একটা খসখস আওয়াজে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

ঘরের সিলিং-এ অর্থাৎ উপরে এতক্ষণ একটা বেগুনী আলো চক্রাকারে বনবন করে ঘুরছিল। উড়ন্ত যন্ত্রটা যখন পৃথিবী ছেড়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছিল তখন বেগুনী আলোটা প্রথম ঘুরতে আরম্ভ করে। এখন আলোটার রঙ ক্রমশঃ বদলে হলুদ হয়ে যাচ্ছে আর ঘোরার গতিও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

রামকৃষ্ণবাবু উঁকি দিয়ে বাইরে কি যেন দেখছিলেন।

টুটুল বলল, "স্যার—এদিকে দেখুন—ঘরের আলোটা রঙ বদলাচ্ছে।"

রামকৃষ্ণবাবু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "হুঁ—একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বোধহয় আমাদের উড়ন্ত যন্ত্রটা এবার নীচের দিকে নামছে, তাই ঘুরন্ত আলোটার গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে, আলোর রঙ বদলে যাচ্ছে।"

টুটুল সবিস্ময়ে বলল, "উড়ন্ত যন্ত্রটা কোথায় নামছে স্যার?"

—"তা তো জানি না। হয়ত কোন গ্রহে কিংবা তারায় এবার আমরা নামব বেঁটে মানুষরা হয়ত সেই তারা বা গ্রহের বাসিন্দা।"
মাথার উপরের আলোটা আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে থেমে

গেল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণবাবু ও টুটুল আবার বাইরে উঁকি দিল।

উড়ন্ত যন্ত্রটা সত্যি এবার একটা সমতল জায়গার উপর নামছে। কোন অজানা স্থলে এবার বোধহয় তারা অবতরণ করবে।

ঘরের দেওয়ালে খুট করে শব্দ হল। কিছুটা ফাঁক হয়ে দরজার মত হল। দুজন বেঁটে মানুষ কোথা থেকে ছুটে এসে ঘরে ঢুকে দেওয়ালের একটা স্যুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে আর এক জায়গায় দেওয়ালের কিছু অংশ সরে গেল। যে মই-এর সাহায্যে টুটুল যন্ত্রটার ভিতরে ঢুকেছিল, মইটা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল। মই বেয়ে বেঁটে মানুষরা তরতর করে নীচে নেমে পড়ল।

নামবার সময় টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবুকে হাত নেড়ে নীচে নামার জন্য ইঙ্গিত করল।

টুটুল আর দেরী করল না। বেঁটে মানুষদের সঙ্গে সেও দ্রুতপায়ে নেমে পড়ল। তার পেছনে নামলেন রামকৃষ্ণবাবু।

নীচে নেমে টুটুল তো অবাক। সে যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, সে জায়গাটাকে একটা লম্বা রাস্তা বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু রাস্তাটা ইঁটের তৈরী নয়, মাটিরও নয়, শহরের মত পিচের রাস্তাও নয়। খুব চকচকে ধূসর রঙের পাথর দিয়ে বোধহয় রাস্তাটা তৈরী। হাঁটতে গেলেই পা পিছলে যাবে মনে হয়।

চারপাশে হালকা নীল আলো ছড়িয়ে রয়েছে। সূর্যের বা চাঁদের আলো যেমন হয় তেমন নয়, ছেলেবেলায় তার বাবা তাকে একটা খেলনা রঙীন নীল চশমা কিনে দিয়েছিল, সেই রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে সব কিছু কেমন নীল নীল দেখাত, এখানেও চারপাশটা সেরকমই দেখাচ্ছে। শুধু পায়ের তলার রাস্তাটার রঙ ধূসর।

এখানকার সূর্যের রঙ কি তাহলে নীল? তাই কি চারপাশে হালকা নীল রঙের এত বাহার?

টুটুলের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে হঠাৎ রামকৃষ্ণবাবু চিৎকার করে উঠলেন—"ডাইনোসর—ডাইনোসর!"

টুটুল পেছন ফিরে দেখল, মাস্টারমশায় কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছেন।

সে বলল, "ডাইনোসর কি স্যার?"

—"ডাইনোসর-এর নাম শোন নি? ঐ দেখ—ঐ যে—" বলে রামকৃষ্ণবাবু তার দক্ষিণ দিকে আঙ্গুল তুলে দেখালেন।

সেদিকে তাকিয়ে টুটুল দেখল, অবিশ্বাস্য বিপুলাকার এক ভয়ঙ্কর জন্তু তার দিকে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। জন্তুটা প্রায় বিশ ফুট, মানে তিনজন মানুষ যদি একজনের মাথায় আর একজন পরপর দাঁড়ায় তাহলে যতটা উঁচু হয়, ঠিক ততটা উঁচু। আর জন্তুটার নাকের ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা। জন্তু নয় যেন চার পাওয়ালা একটা বিরাট দৈত্য।

টুটুল সভয়ে রামকৃষ্ণবাবুর কাছে সরে এসে বলল, "স্যার, ওটা জন্তু না অন্য কিছু?"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "এটা ডাইনোসর নামে এক জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবী থেকে এই জন্তুটি অনেককাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে বড় বড় মিউজিয়ামে এদের হাড় বা কঙ্কাল রক্ষিত আছে। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে পৃথিবী থেকে যে জন্তু বহুকাল আগে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই জন্তু এখানে কি করে বেঁচে আছে?"

টুটুল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সে দেখতে পেল, ডাইনোসর নামে জন্তুটা এবার দ্রুত পায়ে ক্যাঙ্গারুর মত মাথা উঁচু করে হাঁ করছে আর তার মুখের ভিতরে তরবারির মত ধারালো দাঁত দেখা যাচ্ছে। সে রামকৃষ্ণবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "ভয় পেও না। বিজ্ঞানের বই-এ পড়েছি, এই জন্তুটা দেখতে বিশাল বটে কিন্তু এর মগজ খুব ছোট, মানে বুদ্ধি খুব কম। মনে হয় এখানকার বেঁটে মানুষদের এটা একটা

পোষা জন্তু।”

মুখে একথা বললেও রামকৃষ্ণবাবুর নিজেরও ভয় ভয় করছিল। জন্তুটা খুব কাছে এগিয়ে আসছে দেখে তিনি ছুটে পালাবেন কিনা ভাবছিলেন।

জন্তুটা খুব কাছে আসতেই দু'জন বেঁটে মানুষ (যারা উড়ন্ত যন্ত্রটার ভিতর থেকে নেমেছিল) জন্তুটার কাছে এগিয়ে গেল। তখন জন্তুটা পা মুড়ে রাস্তায় বসে পড়ল। বেঁটে মানুষরা তার লেজ ধরে পিঠে উঠে গেল টুটুল এবং রামকৃষ্ণবাবুকে তাদের মত জন্তুটার লেজ ধরে পিঠে ওঠার জন্য হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতে লাগল।

টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবু পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। রামকৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর টুটুলকে ইশারা করলেন।

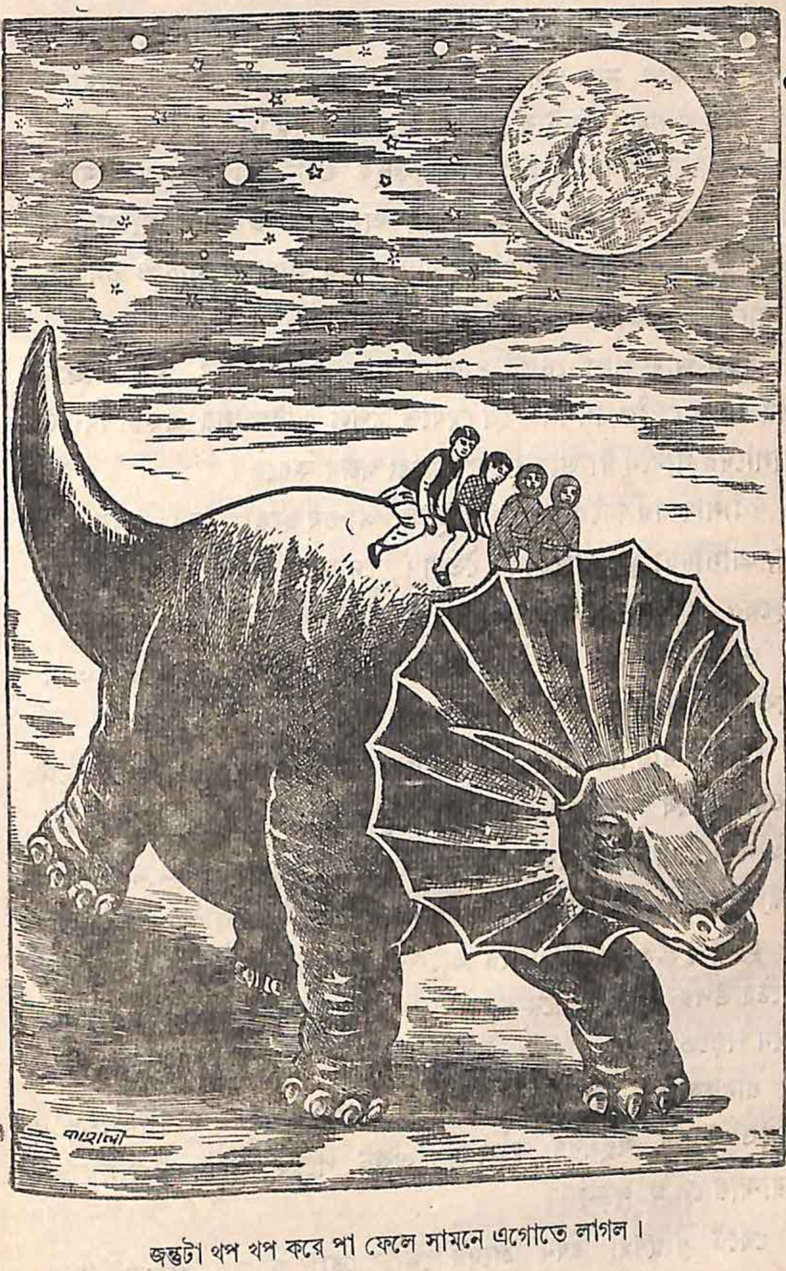
দু'জনে এগিয়ে গিয়ে বেঁটে মানুষদের মতই জন্তুটার লেজ বেয়ে তার পিঠে উঠে পড়ল।

জন্তুটা তখন উঠে দাঁড়াল। থপ থপ করে পা ফেলে সামনে এগোতে লাগল।

জন্তুটার পিঠে চড়ে তারা যে কোথায় চলেছে তা টুটুল কিছুই ভেবে পেল না। বেঁটে মানুষ দু'জনও কাছে বসে আছে। তাদের গা থেকে পোড়া কাঠের মত গন্ধ বেরুচ্ছে। রামকৃষ্ণবাবুর মুখ গম্ভীর, চোখ বোজা। তিনি ভয়ে চোখ বুজে আছেন, না মনে মনে ভগবানকে চোখ বুজে ডাকছেন তা টুটুল ঠিক বুঝতে পারল না।

রাস্তা বুঝি আর শেষ হয় না। ডাইনোসর চলেছে তো চলেছেই। মাঝে মাঝে ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ছে। নিঃশ্বাস নয়, যেন ঝড়। হু-হু করে বাতাস বইছে।

বেঁটে মানুষরা নিজেদের মধ্যে কি যেন ফিস ফিস করে আলোচনা করছে। আর এক একবার আড়চোখে টুটুলের দিকে তাকাচ্ছে। সেই চাহনিতে টুটুলের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।



জন্তুটা থপ থপ করে পা ফেলে সামনে এগোতে লাগল।

সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে ভগবান থাকেন কিনা কে জানে? সে তবু আকাশের দিকে তাকিয়েই মনে মনে ভগবানকে বলতে লাগল—হে ভগবান, আমাকে এই বেঁটে মানুষরা জন্তুটার পিঠে চড়িয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে, এর পর তারা আমাকে নিয়ে কি করবে, কিছুই জানি না। তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর। আমি এই অপরিচিত জায়গায় মা-বাবাকে ছেড়ে এসে একা মরে যেতে চাই না। তুমি আমাকে বাঁচাও ভগবান, আমাকে রক্ষা কর।

টুটুল আধবোজা চোখে ভগবানকে ডাকছিল, হঠাৎ বিকট গর্জনে তার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। সে দেখতে পেল ডাইনোসর একটা বিরাট প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং গর্জন করছে।

প্রাসাদটার দিকে তাকিয়ে টুটুল আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে হল, প্রাসাদটা বুঝি স্ফটিকের তৈরী। দেওয়াল থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। বিরাট প্রাসাদ।

ডাইনোসর-এর পিঠটা প্রাসাদের দোতলার বারান্দায় এসে ঠেকেছে। বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে।

বেঁটে মানুষরা এবার উঠে দাঁড়াল। ডাইনোসর প্রাসাদের দেওয়াল ঘেঁষে ক্যাঙ্গারুর মত গলা উঁচু করে রইল। বেঁটে মানুষরা সেই গলা ধরে পিঠ থেকে প্রাসাদের দোতলার বারান্দায় নেমে পড়ল। তারপর হাত নেড়ে টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবুকে ডাকতে লাগল।

টুটুল বুঝতে পারল, এবার তাকেও ঐ বেঁটে মানুষদের মত জন্তুটার পিঠের উপর দিয়ে এগিয়ে তার গলা ধরে ঝুলে প্রাসাদের বারান্দায় নেমে পড়তে হবে।

রামকৃষ্ণবাবু উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এক পা করে এগোচ্ছিলেন। টুটুলও তাঁকে অনুসরণ করল। একটু পরেই দু'জনে প্রাসাদের বারান্দায় নেমে পড়ল।

বেঁটে মানুষরা তখন তাদের ছোট ছোট হাতের আঙ্গুল দিয়ে

সামনের ঘরটা টুটুলকে দেখিয়ে দিল। তারপর আবার ডাইনোসর-এর গলা ধরে তার পিঠে উঠে বসল। ডাইনোসর ঘুরে দাঁড়াল। বেঁটে মানুষদের পিঠে নিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল।

টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবু প্রাসাদের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখল, ডাইনোসরটা এগোতে এগোতে রাস্তার এক জায়গায় বেঁকে তাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

নিঃস্তব্ধ নিঝুম প্রাসাদে এখন দু'জন পৃথিবীর মানুষ ছাড়া হয়ত আর কেউ নেই। চারপাশে ফিকে নীল আলো। সেই আলো প্রাসাদের দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

এখন দিন না রাত্রি, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এখানে সূর্য বা চাঁদ বোধহয় ওঠে না। সব সময় হয়ত একই রকম আলো থাকে।

"কি ভাবছ?"—রামকৃষ্ণবাবুর কথায় টুটুলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

সে বলল, "স্যার—এ জায়গাটা খুব অদ্ভুত লাগছে। আমরা কি পৃথিবী থেকে বহুদূরে কোন গ্রহে এসে পৌঁছেছি?"

রামকৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তার পর বললেন, "নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে আমার মনে হচ্ছে, আমরা কোন গ্রহে নয়, একটা নক্ষত্রে এসে পৌঁছেছি। কোন কোন নক্ষত্রের আলো নীল হয়। চারপাশের রঙ দেখে এটাকে নক্ষত্র বলেই সন্দেহ হচ্ছে।"

টুটুল বলল, "ভূগোলে পড়েছিলাম কোন কোন নক্ষত্র নাকি সূর্যের থেকেও বড় হয়। আমরা কি তেমনই কোন বিরাট নক্ষত্রের রাজ্যে দাঁড়িয়ে আছি?"

"হয়ত তাই হবে। এখন এসব কথা থাক। সামনে ঐ যে ঘরটার দিকে বেঁটে মানুষগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেল, সেই ঘরটায় ঢুকবে নাকি?"

—"ঘরে? ওখানে যদি কোন জন্তুজানোয়ার থাকে? এখানেই তো বেশ আছি।"

"ভয় কি? আমি তো সঙ্গে আছি। ঘরের ভিতর কি আছে তা

দেখে আসি চল।"

রামকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে টুটুল ঘরে ঢুকল। ঘরের একধারে পরপর কয়েকটা টেবিল রয়েছে। টেবিলের উপর খাবার সাজান। সেই উড়ন্ত যন্ত্রটার মধ্যে ওঠার পর বেঁটে মানুষরা তাকে যে রকম সবুজ পানীয় দিয়েছিল, টেবিলের উপর গ্লাসের মধ্যে সে রকম তরল পানীয় রয়েছে। তারপাশে একটা চৌকো ডিশের মধ্যে রয়েছে আপেলের রঙের একটা ফল। তার পাশে ছানার মত সাদা খাবার। বোধহয় যেন অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য টেবিলগুলোর উপর খাবার সাজান আছে।

টুটুলের খুব খিদে পেয়েছিল। কি মনে করে সে একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল।

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "দাঁড়াও, এগুলো প্রকৃতই খাদ্য না বিষ তা আগে আমি পরীক্ষা করে দেখি। তারপর তুমি খাবে।" প্রত্যেক খাদ্য অল্প পরিমাণে মুখে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে তিনি বললে, "খাও। খুব সুস্বাদু খাবার।"

টুটুল খেতে আরম্ভ করল। রামকৃষ্ণবাবুও একটা টেবিলের খাবার হাতে তুলে নিলেন। খেতে খেতে টুটুল ভাবল এখনই হয়ত প্রাসাদের কেউ এসে পড়বে। প্রাসাদের মালিক না হোক অন্তত এক আধজন দাসদাসী চোখে পড়বেই।

কিন্তু খাওয়া শেষ হবার পরও কেউ এল না। শুধু রামকৃষ্ণবাবু একাই ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তিনি ঘরের দেওয়ালে আঙ্গুল ঠুকে ঠুকে কি যেন পরীক্ষা করছেন।

টুটুল ফিরে তাকাতেই রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "এই বাড়ির দেওয়াল কি দিয়ে তৈরী বল তো?"

"পাথরের। তাই না?"—বলল টুটুল।

—"না। দেওয়াল তৈরী হয়েছে কোন ধাতু দিয়ে। পিতল, তামা বা লোহা জাতীয় ধাতু নয়। অন্য কোন ধাতু, যা পৃথিবীতে

পাওয়া যায় না”

—“তাই নাকি ? যাগ গে যা দিয়ে খুশি তৈরী হোক, এবার থেকে বোধহয় আমাদের এই বাড়িতেই থাকতে হবে। চলুন বাড়িটা ঘুরে দেখে আসি ”’

—“আমারও তাই ইচ্ছে। তুমি এতক্ষণ খাচ্ছিলে, তাই তোমায় বলি নি। চল ঘর থেকে বেরুনো যাক।”

বারান্দায় বেরিয়ে এল দুজনে। বারান্দায় ঘুরতে ঘুরতে টুটুল দেখল তিনতলার দিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে।

সে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেল। গিয়ে দেখে পরপর অনেকগুলো ঘর। প্রত্যেক ঘরে খাটের উপর বিছানা পাতা রয়েছে। রামকৃষ্ণবাবুও টুটুলের পাশে পাশেই সব দেখছিল।

খাওয়ার পর থেকেই টুটুলের ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিছানা চোখে পড়তেই সে ঘরে ঢুকে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল।

রামকৃষ্ণবাবু তার পাশে বসে ঘরটার চারদিকে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই টুটুল গভীর ঘুমে নিমগ্ন হল।

দুই

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সে বিছানায় উঠে বসে এদিক ওদিক তাকাল।

সব কিছু তার কাছে কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে সে ভুলেই গিয়েছিল যে সে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এক অজ্ঞাত নক্ষত্রে চলে এসেছে।

প্রথমটা চারপাশে তাকিয়ে কিছুই ঠাহর করতে না পারায় সে হতবুদ্ধি হয়ে উঠে দাঁড়াল।

দাঁড়াতেই ঘরের বাইরের সিঁড়িটা তার চোখে পড়ল। খাবারের টেবিলটা সে দেখতে পেল।

তখন ধীরে ধীরে তার সব কথা মনে পড়ল। তার খেয়াল হল সে যখন এই ঘরের বিছানায় শুয়েছিল তখন মাস্টারমশায় রামকৃষ্ণবাবু তার বিছানায় বসে ছিলেন।

কিন্তু মাস্টারমশায়কে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি তো ঘরে নেই। কোথায় গেলেন ?

ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল টুটুল। এদিক ওদিক তাকাল। না, মাস্টারমশায় বারান্দায়ও নেই।

"মাস্টারমশায়—মাস্টারমশায়"—বলে বারকয়েক ডাকল টুটুল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সে প্রতিটি ঘরে উঁকি দিল।

সমস্ত বাড়িটার সব জায়গায় মাস্টারমশায়কে খুঁজে বেড়াল কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পেল না।

তার সন্দেহ হল যে সে যখন ঘুমিয়েছিল তখন এই নক্ষত্রের বেঁটে মানুষরা হয়ত মাস্টারমশায়কে ধরে নিয়ে গেছে।

কোথায় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছে কে জানে। এখনও মাস্টারমশায় জীবিত আছেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে। এরপর হয়ত তাকেও বেঁটে মানুষরা ধরে নিয়ে যাবে। তারপর……তারপর……

আর ভাবতে পারল না টুটুল। দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ল। কান্নার মত কি যেন তার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠছিল।

মা-র কথা তার মনে পড়ল। পৃথিবী ছেড়ে আসার পর ক'দিন কেটে গেছে কে জানে। এখানে তো সময়ের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ ওঠে না।

মা হয়ত তাকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে গেছে। তাকে খুঁজে না পেয়ে মা হয়ত কত কাঁদছে।

মা বলত বিপদে ধৈর্য হারাতে নেই। মনে সাহস রাখতে হয় তাহলেই বিপদকে জয় করা যায়। সত্যিকার বিপদ আসার আগেই বিপদের ভয়েই মানুষ অর্ধমৃত হয়ে পড়ে তাই সংকট কাটিয়ে ওঠার

শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। সংকটের কল্পনায় ম্রিয়মান না হয়ে সাহসের সঙ্গে বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

মার কথাগুলো মনে পড়তেই টুটুল উঠে দাঁড়াল সে এবার ভাবল হয়ত মাস্টারমশায় বেঁচে আছেন। একা একা ভাল না লাগায় হয়ত এই প্রাসাদের বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছেন।

বাইরে বেরুলে হয়ত তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। মাস্টারমশায় বিজ্ঞান পড়ান, বিজ্ঞানের অনেক কিছু জানেন। হয়ত এই নক্ষত্রের সব রহস্য ভেদ করে তিনি কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে টুটুল প্রাসাদ ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

সামনে ধূ ধূ মরুভূমি যতদূর দৃষ্টি যায় তার মধ্যে মাস্টারমশায়কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

তবে মরুভূমির উপর স্থানে স্থানে বিরাট বালির স্তূপ রয়েছে। সেই স্তূপের আড়ালে মাস্টারমশায় থাকলেও থাকতে পারেন।

ডাইনোসর-এর পিঠে চড়ে সে যে ধূসর পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে এসেছিল সে রাস্তাটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

হয়ত সে রাস্তাটা ছিল প্রাসাদের পিছন দিকে। প্রাসাদের চারপাশেই ঘোরানো বারান্দা। হয়ত পেছনের রাস্তা দিয়েই তারা দোতলার বারান্দায় উঠেছিল।

প্রাসাদের ভিতরে অনেক সিঁড়ি, অনেক ঘর। গোলকধাঁধাঁর মত।

এখন সে প্রাসাদের সামনে বড় ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

কি মনে করে টুটুল মরুভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। সামনে বালির স্তূপের কাছে পৌঁছনই তার উদ্দেশ্য।

যেতে যেতে কিছুটা বালি সে হাতে তুলে নিল। বালি নয় যেন ছোট ছোট সোনার কণা। আলোয় ঝিকমিক করছে। এমন সোনা

রঙের বালি টুটুলও কখনও দেখেনি।

সে অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে বালির স্তূপের কাছে পৌঁছল।

বালির তৈরী একটা বিরাট গামলা উল্টে রাখলে যে রকম দেখায় স্তূপটা অনেকটা সেই রকম।

গামলার মত বালি দিয়ে তৈরী জিনিসটায় একটা মাত্র খুব নিচু ঢোকবার পথ আছে।

বালির গামলার চারপাশে ঘুরে মাস্টারমশায়কে কোথাও দেখতে পেল না টুটুল।

তখন সে নিচু পথ দিয়ে উলটে রাখা গামলার মত ঢিপিটার ভিতরে ঢোকবার জন্য পা বাড়াল।

ভিতরে আবছা অন্ধকার। অনেকটা দূরে একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। সেই সরু আলোর রেখা লক্ষ্য করে এগোতে লাগল টুটুল।

যেতে যেতে চারপাশে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল। আবছা অন্ধকারে ভিতরে কিছুই তার চোখে পড়ল না।

সরু আলোর রেখার দিকে লক্ষ্য রেখে সে বালির গামলার এক কোণে গিয়ে পৌঁছল। দেখল খুব নিচু সরু একটা পথ রয়েছে। বোধহয় এটাই বালির গামলা থেকে বাইরে বেরুবার পথ এত নিচু যে বাইরে থেকে এটা চোখেই পড়ে না।

টুটুল হামাগুড়ি দিয়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে গেল। কিছুদূর যেতেই তার চোখে পড়ল নিচের দিকে পর পর অনেকগুলি সিঁড়ি চলে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় পৌঁছন যাবে কে জানে।

একটা সিঁড়িতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল টুটুল। তারপর খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর সে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। সামনে তাকাতেই তার চোখে পড়ল বিরাট ঢেউ খেলানো লম্বা কাঁচ।

কাঁচটা বোধহয় কয়েকমাইল লম্বা। চিকচিক করছে।

এখানে এতবড় একটা কাঁচ কে কি উদ্দেশ্যে রেখেছে তা ভেবে পেল না টুটুল। একটু এগিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল সেই কাঁচের মধ্যে তার মুখ দেখা যাচ্ছে। যেন একটা বিরাট আয়না অতলে কেউ পেতে রেখেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। কপালের কাছে ছোট ছোট বালির কণা লেগে রয়েছে।

কাঁচটা বোধহয় খুব আস্তে আস্তে নড়ছে তাই মাঝে মাঝে মুখের ছবি আবছা হয়ে যাচ্ছে, আবার একটু পরেই সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

কৌতূহল বশে টুটুল আরও এগিয়ে গেল। কাঁচটার উপরে উঠে সেটাকে ছুঁয়ে দেখবার ইচ্ছায় সে কাঁচের উপর পা রেখে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

কিন্তু দাঁড়াতে পারল না ক্রমশই সে যেন কাঁচের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

সে বুঝতে পারল যে জিনিসটাকে সে একটা বিরাট কাঁচ ভেবেছিল আসলে সেটা কাঁচ নয়। কাঁচের মতই স্বচ্ছ জল। আসলে এটা একটা নদী। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু ডুবতে আরম্ভ করলেই জলের ভিতরে দারুণ স্রোতের টান অনুভব করা যায়।

ডুবতে ডুবতে টুটুল প্রাণরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

সে বড় হয়েছে পাহাড়ী অঞ্চলে। ছেলেবেলা থেকে পাহাড়ী নদীতে সাঁতার কেটেছে। সাঁতরে নদীর এপার ওপার করেছে।

সে সাঁতার কেটে জলের উপর ভেসে থাকার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল স্রোতের টানে সাঁতার কেটে সে অনেক দূরে ভেসে এসেছে। ভাসতে ভাসতে সে মাথা তুলে কোথাও নদীর তীর দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করল। কিন্তু এই কাঁচের মত নদীটার কোথাও কোন তীর চোখে পড়ল না। চারদিকে শুধু জল আর জল।

এই গভীর নদীতে হাঙ্গর বা কুমীর জাতীয় কোন প্রাণী যদি থেকে

থাকে তবে তারা হয়ত গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। কিংবা তিমি বা ডলফিন-এর মত কোন বিরাট প্রাণী যদি, নদীর জলে ভেসে বেড়ায় তারাও আক্রমণ করতে পারে। হয়ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে এই অচেনা অজানা এক নক্ষত্রের রাজ্যের গভীর এক নদীর মধ্যে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে টুটুল সাঁতার কাটছিল। কিন্তু ক্রমশই তার হাত দুটো যেন অবশ হয়ে আসছে।

সে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। দুহাতে জল কেটে সাঁতার দিয়ে এগোন বুঝি আর সম্ভব নয়। তবু যতক্ষণ পারা যায় সাঁতার কাটার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তবে হয়ত তীর দেখা যাবে।

এগোতে এগোতে টুটুলের চোখে পড়ল নদীর মধ্যে কি যেন একটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে আবার কিছুক্ষণ পরে জলের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন উলটো করে রাখা বিরাট লোহার কড়াই!

কিন্তু লোহার কড়াই তো জলে ভাসার কথা নয়। হয়ত কোন কালো পোড়া কাঠ বারবার ডুবছে আর ভাসছে।

যদি কোন রকমে ওটা ধরা যায় তবে ওর উপর উঠে প্রাণ বাঁচান যেতে পারে।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে জিনিসটাকে ধরে ফেলল টুটুল। তারপর তার উপর উঠে বসল।

জিনিসটা কাঠ না লোহা না অন্য কিছু সে কথা ভাবার পরীক্ষা করে দেখার মত অবস্থা তখন আর টুটুলের নেই। চারপাশে জল। কখন যে ভুস করে এটা আবার জলে ডুববে ঠিক নেই।

শরীর খুবই অবসন্ন হয়ে এসেছে। যে কোন সময় অজ্ঞান হয়ে জলে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

জিনিসটার উপর ভাসতে ভাসতে কিছুদূর এগিয়ে গেল টুটুল। আকাশের দিকে তাকাল। ফিকে নীল আকাশ। বহুদূরে মিট মিট করে কয়েকটা তারা জ্বলছে। বহু দূরদিগন্তে আকাশটা বুঝি এই

নদীর সঙ্গে মিশে গেছে।

যে জিনিসটার উপর সে ভেসে চলেছে সেটা এক একবার জলের তলায় কিছুটা ডুবে যাচ্ছে। তখন টুটুল আর বসে থাকতে পারছে না, উঠে দাঁড়াচ্ছে। ডুবন্ত অবস্থায় জল তার বুক পর্যন্ত চলে আসছে। জিনিসটা আবার যখন ভেসে উঠছে তখন টুটুল আবার বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

এইভাবেই সে ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছে। কোন্ দিকে যাচ্ছে তা সে জানে না। কতদিন এভাবে জলের উপর ভাসতে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

নদীর তীর আর কতদূর কে জানে। চারদিকে অনন্ত জলরাশি। আর কিছুই তো চোখে পড়ে না।

তিন

কতক্ষণ জলের উপর ভেসে কেটেছে তা টুটুলের খেয়াল রইল না। একসময় তার মনে হল অল্প দূরে উঁচু জমির মত কি যেন দেখা যাচ্ছে।

ভাসমান জিনিসটার উপর বসে দু-পা জলে ডুবিয়ে পা দিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে তাড়াতাড়ি উঁচু জমিটার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করতে লাগল টুটুল। স্রোতের টানে জিনিসটা দ্রুতবেগে সেই উঁচু জমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। টুটুলের মন আনন্দে নেচে উঠল।

এবার বুঝি সে ডাঙ্গায় পা রাখতে পারবে। ভাসমান জিনিসটা তীরের কাছে আসতে টুটুল লাফ মেরে ডাঙ্গায় উঠে পড়ল।

উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। এগোবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনুভব করল যে তার শরীর এতই ক্লান্ত যে সে আর এগোতে পারছে না। তীরের উপর শুয়ে পড়ল টুটুল।

ফিরে নদীর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল যে জিনিসটার উপর সে এতক্ষণ ভেসে এসেছে সেটাও তীরে থেমে রয়েছে।

ভাল করে জিনিসটা লক্ষ্য করল টুটুল। কাঠ নয়, একটা জীবন্ত প্রাণী। তবে শুশুক না। অন্য কোন জীব। শামুকের খোলের মত শক্ত পিঠ। যেন বিরাট একটা শামুক। খোলের ভিতর থেকে সরু গলা বের করে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। জলের মধ্যে গলা সমেত মুখ শক্ত খোলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

এই বিশাল শামুকের মত প্রাণীটার পিঠে চড়েই সে এতক্ষণ জলে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পৌঁছেছে।

অল্পক্ষণ ডাঙ্গায় থাকার পর প্রাণীটা আবার নদীর জলে নেমে পড়ল।

স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে বহুদূর চলে গেল। ক্লান্তিতে টুটুলের চোখ বুজে এল।

অচৈতন্যের মত শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল তা সে নিজেই টের পেল না।

ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখল সে যেন পৃথিবীতেই আছে। তবে সেই পহাড়ী অঞ্চলে নয়। মা-বাবার সঙ্গে কোথায় যেন বেড়াতে গেছে।

ঘুম ভাঙ্গতেই সামনের কাঁচ নদীটা তার চোখে পড়ল। তার খেয়াল হল যে সে এক অজানা অচেনা জায়গায় শুয়ে আছে।

আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। নদীর কাছে গিয়ে আঁজলা ভরে জল পান করে মুখ হাত ধুয়ে নিল।

ঘুমের ফলে শরীরের ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়েছে। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল জায়গায় জায়গায় জলের মধ্যে ভুড়ভূড়ি উঠছে কোথাও বা সাদা ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠছে।

নদী থেকে মুখ ফিরিয়ে স্থলের দিকে তাকাল সে। চারপাশে ধূসর রঙের ঘাস। কয়েকটা গাছও দেখা যাচ্ছে। গাছগুলো ছোট ছোট। জোরে লাফ দিয়ে উপর দিকে উঠলে গাছের মাথা পর্যন্ত

ছোঁয়া যায়। গাছের ডালে ডালে হলুদ রঙের ফল ঝুলছে।

জায়গাটা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে টুটুল কিছুদূর এগিয়ে গেল। যত এগোচ্ছে গাছের সারি ততই ঘন মনে হচ্ছে। অজস্র ঝোপ ঝাড়। আরও এগোলে হয়ত গভীর জঙ্গল। সে জঙ্গলে বাঘ, সিংহ না থাক তাদের থেকেও ভয়ঙ্কর প্রাণীরা বাস করে কিনা কে জানে। টুটুল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর এগোবে কিনা ভাবতে লাগল। কি করবে স্থির করার আগেই কোথা থেকে হিসহিস শব্দ তার কানে ভেসে এল। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ শব্দ।

এদিক ওদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ল, কয়েকজন বেঁটে মানুষ একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে লম্বা পাইপের মত কি একটা জিনিস হাতে নিয়ে কি যেন করছে।

পাইপের ভিতর থেকে ফোয়ারার মত তরল পদার্থ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। সেই পাইপের তরল পদার্থের কয়েক ফোঁটা ছিটকে এসে টুটুলের গায়ে পড়তেই সে "উঃ—কি গরম" বলে চিৎকার করে উঠল। তার মনে হল তার গায়ে যেন কয়েক ফোঁটা ফুটন্ত গরম জল পড়েছে।

তার কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে বেঁটে মানুষগুলো ফিরে তাকাল। এতক্ষণ তারা টুটুলকে লক্ষ্য করে নি।

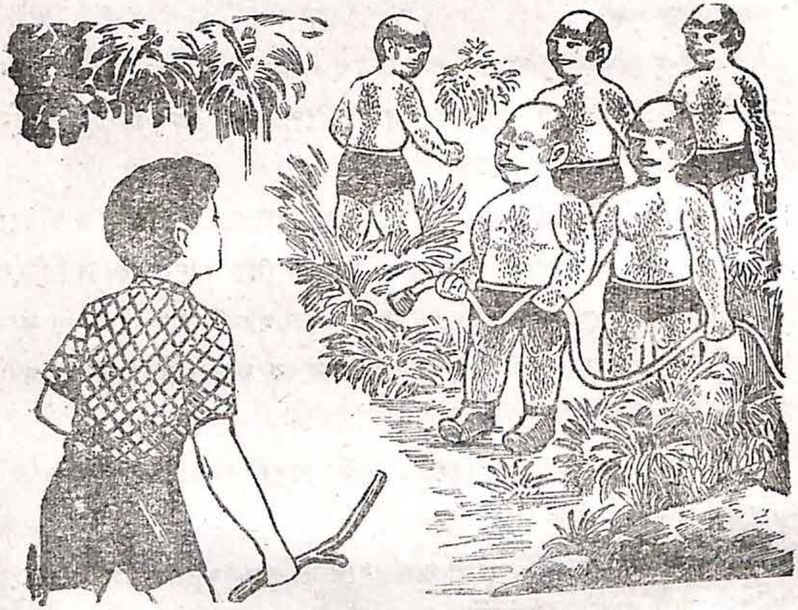
টুটুলও সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে আগে যে ক'জন বেঁটে মানুষ দেখেছে তাদের শরীরে যে ধরণের পোশাক ছিল সেরকম কোন পোশাক এরা পরে নি। খালি গা। ছোট ছোট লোমে ভর্তি। চিবুক ছুঁচলো। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হাত-পা মোটা মোটা এবং শক্ত বলে মনে হয়। বেঁটে লোকগুলো টুটুলের মত কোন মানুষ এর আগে কখনও দেখে নি, তাই হয়ত খুব অবাক হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কি যেন আলোচনা করছে।

টুটুল কি করবে ভেবে স্থির করতে পারছিল না। সে চিৎকার

করে বলল, "তোমরা কে? তোমরা কি আমারই মত মানুষ, না অন্য কিছু?"

বেঁটে লোকগুলো টুটুলের প্রশ্নের উত্তরে চিৎকার করে কি যেন বলল—"ভর-র-র-টু-টু-ইমপি—গ্যা-লা-লি" এই ধরনের শব্দ টুটুলের কানে ভেসে এল, কিন্তু ওদের ভাষার এক বর্ণও সে বুঝতে পারল না।

টুটুল গুনে দেখল, বেঁটে লোকগুলো সংখ্যায় পাঁচজন। এখনই যদি ওরা তাকে আক্রমণ করে, তবে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। ওরা হিংস্র প্রকৃতির কিনা কে জানে?



টুটুল লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

আত্মরক্ষার জন্য টুটুল কাছের ছোট গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিল। তারপর লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। তার উদ্দেশ্য হল বেঁটে লোকগুলোর কাছে গিয়ে সে বোঝাবার চেষ্টা করবে যে সে পৃথিবীর মানুষ, এই গ্রহের অন্য বেঁটে লোকেরা তাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে কোন অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ার নয়।

বেঁটে লোকগুলোর হঠাৎ কি হল কে জানে? গাছের ডাল হাতে টুটুলকে এগোতে দেখে তারা হইহই করে উঠল, তারপর পিছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করল। যেন পালাচ্ছে।

টুটুল তো অবাক। বেঁটে লোকগুলো হয়ত তাকে কোন অচেনা অজানা ভয়ঙ্কর প্রাণী ভেবে ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। টুটুলও ওদের পেছন পেছন ছুটে যেতে যেতে বলল, "শোন আমি তোমাদের শত্রু নই। তোমাদের দেশে এসে পড়েছি। তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে? বেঁটে লোকগুলো ছুটছে তো ছুটছেই। টুটুলের থেকে দ্বিগুন বেগে ওরা ছুটতে পারে। টুটুলও উদ্‌ভ্রান্তের মত তাদের দ্রুতপায়ে অনুসরণ করতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর এগোবার পর সেই বেঁটে লোকগুলোকে আর দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ছোটার ফলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাঁফাচ্ছে। যে জায়গায় সে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানটায় ঝোপ ঝাড় অল্প। গাছের সারি আগের মত ঘন নয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করার পর সে আবার এগোতে লাগল। অল্প দূর যাওয়ার পর একটা বিরাট প্রান্তর তার চোখে পড়ল। সেই খোলা প্রান্তরের একধারে সে যে ধরনের উড়ন্ত যন্ত্র চড়ে পৃথিবী থেকে এই দেশে এসেছিল, সেই ধরনের একটা যন্ত্র পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সে দেখতে পেল সেই বেঁটে মানুষগুলো যন্ত্রটার কাছে কি যেন করছে।

তাদের মধ্যে দুজন যন্ত্রটার মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরেই যন্ত্রটা আকাশের উপর কিছুদূর উঠে ভাসতে লাগল। আর যন্ত্রটার ভিতর থেকে ঘণ্টা বাজার মত শব্দ হতে লাগল। সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! যেন কয়েক শত ঘণ্টা একসঙ্গে বাজছে। কানের পর্দা বুঝি ফেটে যাবে।

দু'হাতে কান চেপে ধরে এদিক ওদিক তাকাল টুটুল। ঘণ্টাধ্বনি চারপাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বুঝি সবাইকে সতর্ক সজাগ করে দিচ্ছে।

আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। অল্পক্ষণ পরেই টুটুল দেখতে পেল, কয়েক শত বেঁটে লোক সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে ছুটে আসছে। তারা এক জায়গায় জড় হতেই প্রথম দেখা খালি গা লোমশ বেঁটে লোকটি আঙ্গুল তুলে টুটুলের দিকে দেখিয়ে দিল। তখন সকলে টুটুলকে ধরার জন্য এগিয়ে এল।

টুটুল ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই কয়েকজন বেঁটে লোক তাকে ধরে ফেলল। গাছের শিকড়ের মত কি সব জিনিস দিয়ে তার হাত দুটো বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে টানতে টানতে উড়ন্ত যন্ত্রটার দিকে নিয়ে চলল।

টুটুলকে বেঁধে ফেলার পরই উড়ন্ত যন্ত্রটার ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেল। শুধু শোনা যেতে লাগল কয়েক শ বেঁটে মানুষের উল্লাস চীৎকার। এবার হয়ত তাকে কোন বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। তার শরীর ক্রমশঃ কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতরে রক্তের বদলে বুঝি বরফের স্রোত বইছে। বুকের ভিতর কি যেন থির থির করে কাঁপছে।

উড়ন্ত যন্ত্রটা উপর থেকে আস্তে আস্তে আবার নীচে নেমে আসছে। বিরাট খোলা প্রান্তরে এসে সেটা নেমে পড়তেই বেঁটে লোকগুলো টুটুলকে যন্ত্রটার ভিতরে টেনে তুলল। তারপর তাকে নিয়ে গেল যন্ত্রটার একেবারে সামনের দিকে। সেখানে রয়েছে ইঞ্জিনের মত যন্ত্রপাতি আর একজন ধাতু নির্মিত মানুষ একটা উঁচু জায়গায় বসে আছে। মানুষটার হাত-পা-মুখ সব কিছু সোনার মত চকচকে ধাতু দিয়ে তৈরী। যন্ত্র-মানুষ। গায়ে অসংখ্য বোতাম। অবাক দৃষ্টিতে টুটুল যন্ত্র-মানুষটাকে দেখছিল একেই কি বলে রোবাট?

পৃথিবীতে থাকতে টুটুল রোবাট-এর কথা শুনেছে। এই রোবাট নাকি মানুষের মত কাজ করতে পারে, বড় বড় বোমারু বিমান চালাতে পারে। এদের নাকি মস্তিষ্ক আছে হৃদয় নেই। তাহলে এই যন্ত্র-মানুষ রোবটই কি এই উড়ন্ত যানের পাইলট? পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা

যে রোবাট তৈরী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সেই যন্ত্র দিয়ে তৈরী রোবাট বা যন্ত্র-পুতুল কি এই দেশে মানুষ আগেই তৈরী করে ফেলেছে ?

"ই-ম-পিলি-ইমপিলি। গি-লি-গি-লি"—একজন বেঁটে লোকের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল। লোকটা টুটুলের কাধ ধরেছিল। সে কথা বলা মাত্রই দুজন বেঁটে মানুষ সেই পাইলট যন্ত্র-মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল। তার গায়ের দুটো বোতাম পরপর টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই উড়ন্ত যান আবার উপরে উঠে দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলল।

এবার কয়েকজন বেঁটে মানুষ টুটুলের পা দুটোও শিকড়ের মত জিনিস দিয়ে বেঁধে ফেলল। হাত তো আগেই বাঁধা ছিল, পা বাঁধার পর টুটুলের আর চলবার ক্ষমতা রইল না। বেঁটে লোকগুলো টুটুলকে ধরে তুলে উড়ন্ত যন্ত্রটার একটা জানালার কাছে নিয়ে গেল।

টুটুল তাকাতেই দেখতে পেল, বহু দূরে নীচে বড় বড় পর্বত। এবার বুঝি উড়ন্ত যান থেকে নীচের পর্বতের চূড়ায় তাকে ছুড়ে ফেলা হবে। এভাবেই অপরিচিত কোন প্রাণীকে হত্যা করা হয়ত এদের নিয়ম।

টুটুল কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ভয়ে তার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে গেল। সে ধপাস করে মেঝেয় পড়ে যেত কিন্তু তার আগেই বেঁটে মানুষরা তাকে ধরে উড়ন্ত যানের মেঝেতে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল।

চার

ডাইনোসরের পিঠে চড়ে প্রসাদে প্রথমে টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবু যে সময়ে পৌঁছেছিলেন, তারপর অনেক সময় বহে গেছে। এর মধ্যে রামকৃষ্ণবাবুর জীবনেও অনেক নতুন ঘটনা ঘটে গেছে, যার সম্বন্ধে টুটুল কিছুই জানতে পারে নি। অথচ মাস্টারমশায়কে খুঁজতে বেরিয়েই তার এই বিপত্তি।

প্রাসাদের ঘরের টেবিলের উপর খাবার খাওয়ার পর টুটুল যখন একটা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন রামকৃষ্ণবাবু সেই বিছানার উপর বসেছিলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ একা বসে থাকতে তাঁর ভাল লাগল না। তখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে এদিক ওদিক ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল।

অদূরে বিস্তীর্ণ মরুভূমি প্রান্তর এবং তার মধ্যে সুউচ্চ বালির ঢিপিগুলি তাঁকে আকর্ষণ করল।

তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন অল্পদূরে ঘুরে বেড়িয়ে আবার কিছুক্ষণ পরেই তিনি প্রাসাদে টুটুলের কাছে ফিরে আসবেন।

গেট থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই কোথা থেকে একজন বেঁটে মানুষ ছুটে এল।

লোকটা ছুটে এসে তার কাছে থমকে দাঁড়াল। কি যেন বলল।

রাককৃষ্ণবাবু প্রথমে একটু ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভয় কেটে গেল। কারণ বেঁটে মানুষটার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে যেন হাঁসি দিয়ে বোঝাতে চাইছে যে সে তার ক্ষতি করবে না।

ভাষা বোঝা না গেলেও কেউ হাসলে বা কাঁদলে বোঝা যায়।

রামকৃষ্ণবাবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

বেঁটে লোকটা তখন আঙ্গুল তুলে মরুভূমির একটা জায়গার দিকে নির্দেশ করল।

রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন সেখানে আরও একজন বেঁটে মানুষ বালির মধ্যে ধাতু দিয়ে তৈরী একটা চাদরের উপর বসে আছে।

প্রথম বেঁটে লোকটির ইঙ্গিতে রামকৃষ্ণবাবু কৌতূহল বশে সেদিকে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে দেখল সোনার কণার মত বালি চারদিকে ছড়ানো। কিন্তু বালুকণাগুলি উত্তপ্ত নয়। হয়ত এটা পৃথিবীর মরুভূমির মত কোন মরুভূমি নয়। অনেকটা সেরকম দেখতে একটা জায়গা মাত্র।

দ্বিতীয় বেঁটে লোকটির কাছে গিয়ে রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন, লোকটি একটা খাতার উপর খুব মনযোগ দিয়ে কি যেন লিখছে। খাতা কাগজের তৈরী নয়, অনেকটা প্লাষ্টিক জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে খাতার পাতা তৈরী হয়েছে। লোকটার হাতে ছোট একটা পেন্সিল। তা দিয়ে লোকটা লিখছে, কিন্তু কি ভাষায় লিখছে তা বোঝার জো নেই। কারণ লেখার হরফগুলো মোটেই রামকৃষ্ণবাবুর পরিচিত নয়। এর আগে এমন ধরনের হরফ তিনি কখনও দেখেন নি।

রামকৃষ্ণবাবু ও প্রথম বেঁটে মানুষটির পায়ের শব্দ শুনে দ্বিতীয় বেঁটে লোকটি পেন্সিল থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল। তারপর ভুরু কুঁচকে অন্য বেঁটে লোকটি কি যেন জিজ্ঞাসা করল।

সেই লোকটি হাত নেড়ে নেড়ে কি সব উত্তর দিয়ে গেল। রামকৃষ্ণ বাবুর মনে হল, লোকটি বোধহয় বোঝাচ্ছে যে সে যাকে সঙ্গে এনেছে সে পৃথিবীর মানুষ।

অবশ্য ওদের ভাষা রামকৃষ্ণবাবু বুঝতে পারলেন না, শুধু কতকগুলি শব্দ শুনতে পেলেন।

সম্ভবত রামকৃষ্ণবাবু পৃথিবী থেকে এসেছেন বুঝতে পেরে পেন্সিল

হাতে বেঁটে লোকটি তাঁকে পাশে ধাতুর পাতলা চাদরের উপর বসতে ইঙ্গিত করল।

রামকৃষ্ণবাবু লোকটির পাশে বসে পড়লেন।

তখন লোকটি কিছুক্ষণ রামকৃষ্ণবাবুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তারপর খাতার পাতায় পেন্সিল দিয়ে দাগ টানতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরেই রামকৃষ্ণবাবু লক্ষ্য করলেন, বেঁটে লোকটি হুবহু তাঁর ছবি খাতার উপর এঁকে ফেলেছে।

ছবিটা এঁকেই লোকটি সেটা রামকৃষ্ণবাবুর চোখের কাছে এগিয়ে ধরল।

এত অল্প সময়ে এত সুন্দর প্রতিমূর্তি যে কেউ আঁকতে পারে তা রামকৃষ্ণবাবু কোনদিন ভাবতেও পারেন নি। তার মন খুশি হয়ে উঠল।

তিনি বললেন একবার চারপাশের মরুভূমি আর একবার উপরের আকাশের দিকে দেখিয়ে—"আমরা কোথায় বসে আছি? এটা কি কোন গ্রহ?"

লোকটা রামকৃষ্ণবাবুর কথা শুনে কি বুঝল কে জানে? সে তার খাতার উপর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকল!

সে ছবিতে ফুটে উঠল পাহাড়-পর্বত, ধূ-ধূ প্রান্তর, আঁকা-বাঁকা, নদী, নদীর তীরে বাড়ি ঘর ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণবাবুর মনে হল, লোকটা বোধহয় ছবির সাহায্যে তাঁকে এই জায়গার প্রাকৃতিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করছে।

ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছুক্ষণ দেখে আবার বললেন, "আমরা কোথায় বসে আছি? কোন্ গ্রহে?"

বেঁটে লোকটা বোধহয় রামকৃষ্ণবাবুর প্রশ্ন এবার ঠিক বুঝতে পারল না।

রামকৃষ্ণবাবু তখন লোকটার হাত থেকে পেন্সিল নিয়ে তার খাতার উপর চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী, নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে যে সৌরজগৎ, তার ছবি এঁকে দেখিয়ে বললেন, "কোথায় আছি?"

এবার বোধহয় বেঁটে লোকটি তাঁর কথা অনুমান করতে পারল। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে খাতা নিয়ে একটা নীল আকাশের মধ্যে একটা বিরাট নক্ষত্র এঁকে বার বার আঙ্গুলের টোকা দিয়ে নক্ষত্রটা দেখাতে লাগল।

রামকৃষ্ণবাবু এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে পৃথিবী থেকে বহু দূরে এক নক্ষত্রের রাজ্যে এসে পড়েছেন। তখন তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন জাগল।

ছবির মাধ্যমে এতক্ষণ ছ'জনের কথা চলছিল, এর পর ছ'জন বোবা লোক হাত-মুখ নেড়ে যেভাবে কথাবার্তা বলে, সেভাবে ভাব-বিনিময় আরম্ভ হল।

প্রথম বেঁটে মানুষটি এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার সেও আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তিনজনেই উঠে পড়ল। বেঁটে মানুষেরা রামকৃষ্ণ-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে নানা জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল। কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও শীতল জলের ফোয়ারা, কোথাও মরুভূমির মধ্যে আলেয়ার আলো।

কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর রামকৃষ্ণবাবু প্রাসাদে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। বেঁটে মানুষ ছ'জনের কাছে বিদায় নিয়ে প্রাসাদের দিকে পা বাড়ালেন।

বেঁটে লোক ছ'জন নিজেদের কাজে অন্যদিকে চলে গেল।

ফিরতে ফিরতে রামকৃষ্ণবাবু ভাবলেন যে প্রাসাদে পৌছে তিনি টুটুলকে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। টুটুল যদি ঘুম থেকে না জেগে থাকে, তবে তাকে উঠিয়ে সব কথা জানাতে হবে।

তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা কাউকে না বলা পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু প্রাসাদে ফিরে ঘরে ঢুকে তিনি টুটুলকে বিছানার উপর দেখতে না পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেলেন।

প্রথমে ভাবলেন, টুটুল হয়ত কাছাকাছি কোথাও আছে। বারান্দায় এসে তিনি টুটুলের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না।

তখন রামকৃষ্ণবাবু প্রাসাদের প্রতিটি ঘরে ঢুকে টুটুলের অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় অধীর হয়ে তিনি প্রাসাদের দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে চারপাশে দেখতে লাগলেন।

তিনি ভাবলেন, হয়ত টুটুল ঘুম থেকে জেগে উঠে তাঁকে দেখতে না পেয়ে তাঁকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আকাশে একটি উড়ন্ত যানের বিকট শব্দ তাঁর কানে ভেসে এল।

উপরে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একটি উড়ন্ত যান ধীরে ধীরে প্রাসাদের কাছে নামছে।

যে উড়ন্ত যানে চড়ে তিনি পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রে এসেছেন, এই ড়ন্ত যানটি তার থেকে অনেক ছোট।

বিরাট মৌমাছির মত ভন্ ভন্ শব্দ করে উড়ন্ত যানটি স্থলে নেমে পড়ল।

কৌতূহল বশে রামকৃষ্ণবাবু এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই কি ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি দেখতে পেলেন, যন্ত্রটির ভিতর থেকে কয়েকজন বেঁটে মানুষ নামছে। তাদের সঙ্গে টুটুলও রয়েছে।

বেঁটে মানুষরা টুটুলকে ধরাধরি করে প্রাসাদের দিকে নিয়ে আসছে। টুটুলকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কি ভেবে রামকৃষ্ণবাবু তাড়াতাড়ি প্রাসাদে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। অল্পক্ষণ পরে টুটুলও বেঁটে মানুষের সঙ্গে সে ঘরে প্রবেশ করল।

বেঁটে মানুষরা টুটুলকে তার বিছানার উপর বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল। পায়ের শব্দে বোঝা গেল তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবু দুজনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। যখন রামকৃষ্ণবাবুর মনে হল বেঁটে লোকগুলো ধারে কাছে আর নেই তখন তিনি টুটুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার? কোথায় গিয়েছিলে? উড়ন্ত যান করে ফিরে এলে কি ভাবে?"

টুটুল বলল, "সে অনেক কাণ্ড মাস্টারমশায়। মরে যায় নি, এটাই যথেষ্ট। ওঃ, এই বেঁটে লোকগুলো মোটেই সুবিধের নয়।"

"কি ব্যাপার? খুলেই বল না।"

"শুনে আর কি হবে। বরং যেমন করে হোক এখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখুন। এখানে থাকলে কবে যে এই বেঁটে বজ্জাতগুলোর হাতে প্রাণ হারাব, ঠিক নেই।"

"পৃথিবীতে তো ফিরতেই হবে। তার আগে এখানকার ব্যাপার-স্যাপার জেনে নিই। তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ। কি হয়েছিল, কোথায় গিয়েছিলে, কিছুই বলছ না।"

"বলছি স্যার। আপনাকে তো সব জানাবই। এখানে আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?"

একথা বলে টুটুল একটু থেমে চুপ করে রইল। তার পর ধীরে ধীরে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা একে একে বলে গেল।

সব শেষে বলল, "আমার মনে হয় এই বেঁটে লোকগুলো মোটেই ভাল নয়।"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম। তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর আমিও ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। তখন দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তারা আমার সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করেছে। তাদের কাছ থেকে আমি এ জায়গাটার বিষয় অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমার কি মনে হয় জান?"

"কি ?"

"তুমি ঐ যে বললে, গাছের ডাল হাতে নিয়ে বেটে লোকগুলোর দিকে এগোচ্ছিলে, তাতেই ওরা তোমাকে শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল।"

"কিন্তু আমি তো ওদের মারবার জন্য ডাল ভেঙ্গে হাতে নিই নি। আমি আত্মরক্ষার জন্য ওটা নিয়েছিলাম।"

"সেটা ওরা, ঠিক বুঝতে পারে নি।"

"হয়ত তাই হবে কিন্তু ওরা আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছিল কেন ?"

"তুমি যাতে পালিয়ে না যাও বা কোন অঘটন না ঘটাও সেজন্যই বোধহয় হাত-পা বেঁধেছিল। পা না বাঁধলে হয়ত উড়ন্ত যান থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে পারি, এমন আশঙ্কা হয়ত ওদের মনে ছিল। আচ্ছা, কখন ওরা তোমার বাঁধন খুলে দিল ?"

"আমি যখন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম অথচ সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় নি তখন ওরা স্পঞ্জের মত কি একটা জিনিস আমার গায়ে ঘষে দিতে লাগল। বোধহয় কোন ওষুধ। সেই ওষুধের সাহায্যেই বোধহয় আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। জ্ঞান ফিরে দেখি বাঁধন সব খুলে দিয়েছে। সবাই উৎসুক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।"

"তারপর ?"

"তারপর ওদের একজন উড়ন্ত যানে দেওয়ালে টাঙ্গানো টেলিফোনের মত একটা যন্ত্র হাতে তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল। বোধহয় এই জায়গার অন্যান্য লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার বিষয়ে জেনে নিল। তারপর কিছুক্ষণ পরেই উড়ন্ত যান এই প্রাসাদের কাছে এসে নামল। আমাদের নিয়ে এরা ভয়ঙ্কর কিছু একটা করার মতলবে আছে। আপনি যাই বলুন, এদের মোটেই ভাল বলে মনে হয় না।"

টুটুলের কথা শুনে রামকৃষ্ণবাবু কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর নিজের অভিজ্ঞতার কথা টুটুলকে শোনালেন।

কথা বলতে, বলতে তিনি বারবার হাই তুলছিলেন। একবার তিনি

বললেন, "আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। বিছানায় একটু গড়িয়ে নি। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে তুমি আবার আমাকে ছেড়ে একা কোথাও চলে যেও না।"

টুটুল বলল, "না, না, আর একা কোথাও বেরুব না। যেখানে যাব, আপনার সঙ্গেই যাব। যা বিদঘুটে রাজ্য। নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি এখানেই বসে থাকব।"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "এখন বোধহয় রাত্রি, তাই আমার ঘুম আসছে। এখানে তো সময়ের হিসেব পাওয়া যায় না। বেঁটে লোকরা কি দেখে বোঝে কে জানে?"

টুটুল বলল, "আমার মনে হয়, এরা বোধহয় আকাশের তারা দেখে সময় ঠিক করে। তারাগুলো কখনও মিটমিট করে, কখনও বা উজ্জ্বল দেখায়। তারার আলোই ওদের হয়ত সময় জানিয়ে দেয়, তাই না?"

"কি জানি? হতেও পারে। আমি লক্ষ্য করেছি, ওরা মাঝে মাঝেই উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। যাক গে, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"—বলে রামকৃষ্ণবাবু আবার হাই তুললেন। তারপর নরম ফোমের মত বিছানায় শুয়ে পড়লেন। টুটুল বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করল রামকৃষ্ণবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘরের চারদিকে দেখতে লাগল টুটুল। কিন্তু কতক্ষণ আর একা বসে থাকা যায়। সে ভাবল, প্রাসাদের বাইরে না-ই বা গেলাম কিন্তু বারান্দায় যেতে তো দোষ নেই। সে বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বারান্দা থেকে নীচে ঝুঁকে দেখতে পেল দরজার সামনে দু'জন বেঁটে লোক পায়চারি করছে।

এবার আর পৃথিবীর মানুষদের প্রাসাদে একা রেখে যাওয়া হয়নি। ঐ দু'জন বেঁটে লোক বোধহয় দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে।

ইচ্ছে হলেও প্রাসাদ ছেড়ে পালাবার উপায় নেই। লোকগুলো উপরের দিকে তাকতেই টুটুল বারান্দার রেলিং ছেড়ে সরে এল।

সামনে তাকিয়ে দেখল যে উড়ন্ত যানে চড়ে এবার সে প্রাসাদে এসেছে, সেটা এখনও রাস্তায় পড়ে আছে। সেই যানের উপরের ঢাকনাটা কে বা কারা যেন খুলে ফেলেছে। ভিতরে যন্ত্রটার ইঞ্জিনের কাছে সেই রোবট বা যন্ত্র-মানুষটার যান্ত্রিক হাত-পা কলকজা দিয়ে আটকান। ওর শরীরের অসংখ্য বোতাম জ্বলজ্বল করছে।

দূরে একটা পাথরের তৈরী ছোট বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাড়িটার ঘরের একটা জানালায় আলোর মত কি যেন জ্বলছে। ঘরের ভিতরে কারা যেন চলাফেরা করছে। সেখান থেকে একটানা 'হি-স-স' 'হি-স-স' শব্দ ভেসে আসছে।

বাড়িটার ভিতরে কি হচ্ছে কে জানে? সব কিছুই যেন ভুতুড়ে কাণ্ড। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে টুটুল হঠাৎ প্রাসাদের ঘরের ভিতরেও 'ঘ-র-র-ঘঘ-ঘ-র-র-ঘঘ' শব্দ শুনতে পেল। রামকৃষ্ণবাবু যেখানে শুয়ে আছেন, সেখান থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে রামকৃষ্ণবাবুর মুখের কাছে ঝুকে দেখতে লাগল টুটুল। না, ভয়ের কিছু নয়। রামকৃষ্ণবাবুর ঘুমের ঘোরে নাক ডাকছে। টুটুলের ভাল লাগছিল না। সেও তার মাস্টারমশায়ের পাশে বিছানার উপর গা এলিয়ে দিল।

পাঁচ

ঘরের মধ্যে একটানা কলিং বেল বাজলে যে রকম শব্দ হয়, সে রকম শব্দে টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবুর প্রায় একই সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দু'জনেই বিছানায় উঠে বসলেন। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কতক্ষণ যে তাঁরা ঘুমিয়েছিল তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না।

এদিক ওদিক তাকাতেই তাঁদের চোখে পড়ল সরু তারের মত একটা আলোর রেখা দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে এবং সেখান থেকেই

একটানা শব্দ হচ্ছে।

অল্পক্ষণ পরেই শব্দ থেমে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবুজ পোশাক পরিহিত একজন বেঁটে লোক দু'হাতে দুটো ডিশ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

সে ডিশ দুটো টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুর হাতে তুলে দিল, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

টুটুল ভেবেছিল ডিশের উপর বুঝি খাবার আছে, কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। সে দেখতে পেল ডিশের উপরে খুব ছোট একটু বড়ি বা ট্যাবেলেট রয়েছে। অনেকটা ওষুধের ট্যাবলেটের মত। রামকৃষ্ণবাবুর ডিশের উপরও একই জিনিস। ডিশের ট্যবলেট দিয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে টুটুল বেঁটে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটা তখন হাত নেড়ে নিজের মুখের কাছে হাত নিয়ে ট্যাবলেটটা খেয়ে ফেলতে ইঙ্গিত করল।

রামকৃষ্ণবাবু ট্যাবলেটটা হাতে তুলে নিজের মুখের কাছে নিয়ে বললেন, "এটা কি খেতে বলছ?"

বেঁটে লোকটা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যেতে রামকৃষ্ণবাবু টুটুলকে বললেন, "ট্যাবলেটটা খেয়ে ফেল। এই বড়ির মত জিনিসটা খাবার জন্যই দিয়েছে মনে হয়।"

টুটুল বলল, "এতটুকু একটা বড়ি খেয়ে আমার পেটের একটা কোণাও ভরবে না। ঘুম থেকে উঠলে আমার দারুণ খিদে পায়। তাছাড়া এটা খাবার বড়ি না বিষ, তাই বা কে জানে?"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "বিষ নয়, কারণ আমি যখন বাইরে বেরিয়ে একজন শিল্পী বেঁটে মানুষের সঙ্গে ছবির মাধ্যমে কথা বলছিলাম, তখন তাকে এ ধরণের একটা বড়ি খেতে দেখেছিলাম।"

"তাই নাকি? কিন্তু এতটুকু বড়ি খেয়ে ওদের পেট ভরে কি করে?"

"আমি এই প্রশ্নই ইঙ্গিতে শিল্পী বেঁটে লোকটাকে করেছিলাম।"

"লোকটা কি উত্তর দিল?"

"লোকটার সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি নি। তবে আভাসে ইঙ্গিতে সে যা বুঝিয়েছে তা হল এই, বড়ি খেলে বহুদিন আর খিদে পায় না। এরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই বড়ি আবিষ্কার করেছে। রান্না-বান্না, চাষ-বাস, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে পৃথিবীর মানুষ অনেক সময় নষ্ট করে। এদের এসব ঝামেলা নেই। একটা বড়ি খেলেই বোধহয় এক মাস খিদে পায় না।"

টুটুল গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। একটু পরে বলল, "তাহলে কি এরা চাল, রুটি, তরকারি এসব কিছু খায় না?"

"বোধহয় না। আমি যখন বাইরে গিয়েছিলাম তখন কোথাও ধানের ক্ষেত বা গমের ক্ষেত দেখি নি। তবে বড়ি ছাড়া স্বাদের জন্য এরা বোধহয় মাঝে মাঝে গাছের রস বা ফল খায়।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমি নদীর ওপারে ছোট ছোট গাছ দেখেছি। তাতে ফল ছিল, গাছ থেকে সাদা রস বেরুচ্ছিল। আমরা যখন প্রথম এখানে এলাম, তখন ওরা বোধহয় ঐ গাছের জমানো রস আর ফলই আমাদের খেতে দিয়েছিল—তাই না মাস্টারমশায়?"

"তাই হবে। নাও, এবার ট্যাবলেট খেয়ে নাও। আচ্ছা দাঁড়াও, আগে আমি খাই, তারপর তুমি খেও। যদি বিষ হয়, তবে তুমি অন্তত বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে।"

কথা শেষ করে রামকৃষ্ণবাবু ডিশের ট্যাবলেট মুখে পুরে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা চুষে চুষে খেয়ে ফেললেন। তারপর ঢেকুর তুলে বললেন, "সত্যি, দারুণ পেট ভরে গেছে। পৃথিবীর মানুষ যদি এমন ট্যাবলেট আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে তাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে যেত।"

রামকৃষ্ণবাবুর দেখাদেখি টুটুলও ডিশের উপরের ট্যাবলেট খেয়ে ফেলল। অল্পক্ষণ পরেই তারও মনে হল যে পেট একেবারে ভর্তি হয়ে

গেছে। খিদে পাবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই বড়ি একটা খেলে সত্যি বোধহয় এক মাস খিদে পায় না। কিছুক্ষণ পরেই তিনজন বেঁটে মানুষ ঘরে প্রবেশ করল। তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল।

টুটুল উঠল না। রামকৃষ্ণবাবুও বেঁটে মানুষদের ডাকে সাড়া দিলেন না। নীরবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছয়

বেঁটে মানুষ তিনজন তখন কাছে এসে দুজনের হাত চেপে ধরল। ভাবখানা এই, যদি তারা না যায়, তবে তাদের জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে।

হাত ধরতেই রামকৃষ্ণবাবু উঠে দাঁড়ালেন। টুটুলও দ্বিধা কাটিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। সে ভাবল, তার যখন পালাবার কোন উপায় নেই, তখন এই বেঁটে লোক-গুলোর আদেশ পালন করাই ভাল। না হলে, কে জানে, এই অদ্ভুত মানুষেরা হয়ত তাকে খুন করে ফেলবে।

বেঁটে লোকগুলো টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে লম্বা বারান্দার এককোণে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেল।

দেওয়ালে ত্রিভূজাকৃতি একটি পাথর টুটুলের চোখে পড়ল। এর আগে সে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু ত্রিভুজ আকৃতির পাথরটি লক্ষ্য করে নি।

একজন বেঁটে লোক সেই পাথরের উপর হাত রেখে জোরে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের কিছুটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। সামনে দেখা গেল ছোট্ট একটা খাঁচার মত ঘর।

বেঁটে লোকেরা সেই খাঁচার ভিতরে উঠতে ইঙ্গিত করল।

রামকৃষ্ণবাবু তাড়াতাড়ি তার ভিতরে ঢুকে গেলেন। টুটুলও তাঁকে অনুসরণ করল।

বেঁটে লোক তিনজন তখন খাঁচায় উঠে ত্রিভুজ আকৃতির পাথরটায় আবার জোরে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল বন্ধ হয়ে গেল এবং খাঁচাটি পাঁচজন প্রাণী সমেত ক্রমশঃ নীচের দিকে নামতে লাগল।

টুটুল এতক্ষণে অনুমান করতে পারল যে খাঁচাটি হল এখানকার লিফ্‌ট। পৃথিবীতে যেমন বড় বড় অফিস-বাড়িতে লিফট থাকে এবং লিফটে চড়ে ওপরে ওঠা এবং নীচে নামা যায়, সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে উঠতে হয় না, এটাও সে রকম কোন লিফ্‌ট। কিন্তু লিফ্‌টটা থামছে না, নামছে তো নামছেই, বুঝি বা পাতালে প্রবেশ করছে।

ব্যাপারটা কি হচ্ছে বোঝার জন্য টুটুল দুপা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু তার হাত ধরে বললেন, "নড়ো না। কিসের থেকে কি ঘটে যাবে কে জানে?"

টুটুল বলল, "আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে স্যার? পাতালে? লিফ্‌টটা কি থামবে না?"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। দেখাই যাক না কি হয়।"

ওদের কথা বলতে দেখে বেঁটে লোকগুলো ফিরে তাকাল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে কি যেন লক্ষ্য করতে লাগল।

টুটুল তা দেখে চুপ করে গেল। অল্পক্ষণ পরেই একজন বেঁটে লোক খাঁচার বা লিফটের ভিতরের একটা জায়গার সুইচ-এর মত একটা জিনিস টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌ট থেমে গেল আর সামনেই দেখা গেল একটা বড় ঘর।

লিফট থেকে নেমে সকলে ঘরটায় ঢুকল। ঘরটির আকৃতি ডিমের মত। কোন চকচকে ধাতু দিয়ে তৈরী। ঘরের মধ্যে একটা ছোট ধাতুদণ্ড মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বারবার ওঠানামা করছে।

ত্রিকোণ আকৃতির একটি টেবিল ঘরের মাঝখানে রয়েছে এবং তার

চারপাশে পিঠহীন কয়েকটি চেয়ার। চেয়ারগুলোর উপর কয়েকজন বেঁটে লোক বসে আছে। টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবু ঘরে ঢুকতেই তাঁদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বেঁটে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা বলতে লাগল।

তারা জোরেই কথা বলছিল কিন্তু টুটুল তাদের কথার এক বর্ণও বুঝতে পারল না। সে লক্ষ্য করল, ঘরের দরজার উপরে উজ্জ্বল নীল অক্ষরে কি যেন লেখা আছে। টুটুল অক্ষরগুলি পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই অপরিচিত লিপির পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হল না, কারণ ঐ ধরনের কোন অক্ষর আগে পড়া তো দূরের কথা, সে চোখেও কোনদিন দেখে নি।

চেয়ারের উপর যেসব বেঁটে লোকরা বসেছিল, তারা টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবুর কাছে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করল। তারপর গায়ে হাত দিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করতে লাগল। হাতের ও পায়ের আঙ্গুল গুনে দেখল। গায়ের চামড়া অল্প টেনে দেখল পুরু না পাতলা। মাথার চুলগুলোও নেড়েচেড়ে কি যেন পরীক্ষা করল। তারপর ওদের ছেড়ে দিয়ে কি যেন আলোচনা করতে লাগল। কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে গেল।

যে দরজা দিয়ে তারা বেরিয়ে গেল, সেই দরজা দিয়েই অল্পক্ষণ পরেই দুজন বেঁটে লোক আবার প্রবেশ করল। তাদের দু'জনের হাতে সম্ভবতঃ রবারের তৈরী দুটি লম্বা নল। প্রতিটি নলের মুখে কাঁচের মত স্বচ্ছ পদার্থের একটি করে কাপ লাগান আছে। প্রথম বেঁটে লোকটি টুটুলের পা তুলে ধরে পায়ের পাতার তলায় নলের মুখের কাপটি চেপে ধরল। তখন তার পা থেকে কয়েক বিন্দু রক্ত ঝরে পড়ল।

পা থেকে রক্ত বের হওয়া সত্ত্বেও টুটুল কিন্তু ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব করল না। প্রথম বেঁটে লোকটির কাজ শেষ হবার পর দ্বিতীয় জনও

একইভাবে রামকৃষ্ণবাবুর পায়ের তলা থেকে রক্ত নিল।

টুটুল লক্ষ্য করল যে দু'জন বেঁটে লোক তাদের পা থেকে রক্ত নিল, তাদের শরীরের সমস্ত জায়গা পোশাকে ঢাকা। তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ দেহের পোশাক শুধু যে তাদের হাত-পা-গা



পায়ের পাতার তলায় নলের মুখের কাপটি চেপে ধরল।

ঢেকে রেখেছে তাই নয়, মুখ ধূসর রঙের এক রকম হেলমেটে ঢাকা। চোখ দুটো অবশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাও স্পষ্ট নয়, কারণ চোখের উপর চশমার গোলাকার কাচের মত কি যেন স্বচ্ছ পদার্থ রয়েছে।

যে হেলমেটে তারা মুখ ঢেকেছে, তার নাকের অংশ ত্রিকোণ আকৃতির এবং মাথার ঢাকনা সাধারণ মানুষের মাথা থেকে অনেক বড়। পোশাকের পিছন দিকে অর্থাৎ পিঠের উপর দুটি নল ঝোলান রয়েছে। সামনে বুকের কাছে একটি তকমা বা পরিচয়-চিহ্ন। পায়ের তলা থেকে রক্ত নেওয়ার কাজ শেষ করে সেই অদ্ভুত পোশাক পরা দু'জন বেঁটে লোকই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যাবার পর টুটুল কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অপ্রত্যাশিত আগামী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর তার বুঝি কিছুই করবার নেই।

"কিছু বুঝতে পারলে কি টুটুল?"—রামকৃষ্ণবাবুর কথায় টুটুল যেন সম্বিৎ ফিরে পেল।

"কি বুঝব স্যার?"—বলল টুটুল।

"এই বেঁটে বৈজ্ঞানিকরা কি করে গেল?"

"বেঁটে বৈজ্ঞানিক! কোথায়?"

"এই যারা রক্ত নিয়ে গেল, তাদের কথা বলছি।"

"ওরা বৈজ্ঞানিক নাকি?"

"তাই তো সন্দেহ হয়। অবশ্য ডাক্তারও হতে পারে। দেখলে না, একদল প্রথমে আমাদের শরীরের নানা অংশ টিপে পরীক্ষা করল। তারপর দু'জন এসে রক্ত নিয়ে গেল, এবার রক্ত পরীক্ষা করবে। আমরা কি রকম প্রাণী, সেটাই বোধহয় পরীক্ষা করে জানতে চায়।"

টুটুল রেগে বলল, "আমরা কি গিনিপিগ নাকি যে আমাদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। যদি হাতে একটা বন্দুক পেতাম, তাহালে এদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতাম।"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "তুমি খুব রেগে গেছো দেখছি। আমার কিন্তু এদের সম্বন্ধে কৌতূহল বেড়েই চলেছে। এদের কাছে অনেক শেখবার আছে মনে হয়।"

"এরা শেখাবে? এরা নিজেরা কি ছাই জানে যে আমাদের মত পৃথিবীর এক সভ্য জাতির মানুষদের শেখাবে?"

রামকৃষ্ণবাবু মৃদু হেসে বললেন, "আমার তো মনে হয়, এরা পৃথিবীর মানুষ থেকে সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক বেশি উন্নত। তা নইলে সুদূর নক্ষত্র থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছবার মত উড়ন্ত যান তৈরী করতে পারত না।"

"উন্নত হোক আর যাই হোক, এদের ব্যবহার মোটেই ভাল নয়।

পৃথিবী থেকে আমাদের চুরি করে আনবার কি দরকার ছিল ?”

“এরা বোধহয় পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব করতে চায়। বোধহয় আমরাই হব সেই যোগাযোগের মাধ্যম। আমাদের নানা বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে আবার পৃথিবীতে পাঠাবে।”

“আমাদের এরা ট্রেনিং দেবে ? কি বলছেন !”

“অসম্ভব কি। উড়ন্ত যান চালিয়ে পৃথিবীতে যেতে শেখাতে পারে। আরও অনেক বিষয় হয়তো শেখাবে। এমন দিন আসতে পারে যখন পৃথিবীর মানুষ স্বেচ্ছায় এখানে এসে বাস করবে।”

“কি যে বলেন স্যার। যাই হোক, এদের কাছে আমি কোন ট্রেনিং নিতে চাই না। এই বিদকুটে রাজ্যে থাকার একটুও ইচ্ছে আমার নেই। আমি যদি পারি তাহলে—”

টুটুলের কথা শেষ হবার আগেই যারা লিফ্‌ট চালিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, তারা ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের এককোণে ঘড়ির মত একটা জিনিস পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে দেখল, হাত ঘড়ির মত ছোট জিনিসটার সঙ্গে যুক্ত চাবি কয়েকবার ঘুরিয়ে দিল। তারপর অপেক্ষমান লিফ্‌ট-এ উঠে টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবুকে হাত নেড়ে ডাকল।

টুটুল বুঝতে পারল, এবার তাদের লিফ্‌টে উঠে আবার নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। রামকৃষ্ণবাবুও বোধহয় তাই অনুমান করলেন। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে টুটুলের সঙ্গে লিফ্‌টে উঠে পড়লেন।

লিফ্‌ট উপরের দিকে দ্রুতবেগে উঠতে লাগল। টুটুল লক্ষ্য করল, হাতঘড়ির মত জিনিসটা একটা বেঁটে লোক হাতে নিয়ে আবার চাবিটা ঘোরাচ্ছে।

কি আশ্চর্য, চাবি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে টুটুল আর রামকৃষ্ণবাবুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল। তাঁরা এতক্ষণ নিচের ঘরে যে সব কথাবার্তা বলছিলেন তা অবিকল শোনা যেতে লাগল।

তাহলে ওটা ঘড়ি নয় ? আসলে টেপ রেকর্ডার। টেপ রেকর্ডার-

-এর মতই তো ঘড়িটার ভেতর থেকে তাদের কণ্ঠস্বর, আলাপ-আলোচনা সব শোনা যাচ্ছে। এমন কি, সে যে বন্দুক মেরে এই বেঁটে মানুষ-গুলোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, সে কথাও বাদ পড়ে নি। কি সর্বনাশ!

রামকৃষ্ণবাবু বোধহয় টুটুলের মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তিনি টুটুলের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। টেপ রেকর্ডে আমাদের কথা তুললেও এরা কেউ আমাদের ভাষা বোঝে না। এই রাজ্যে আমরাই মাত্র দু'জন পৃথিবীর মানুষ। এরা যে কেউ পৃথিবীর মানুষের ভাষা জানে না, তার প্রমাণ আগেই অনেকবার পেয়েছি। তাছাড়া আমরা তো কোন খারাপ কথা বলি নি।'

যে বেঁটে লোকটা ঘড়ির মত জিনিসটা হাতে নিয়ে রেকর্ড শুনছিল, সে ফিরে তাকাল। রামকৃষ্ণবাবু আর কোন কথা বললেন না। লিফট ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে লাগল।

সাত

কিছুটা ওঠার পর লিফটের ভিতরে ক্রীং ক্রীং শব্দ হতে লাগল। যেন কেউ বাইরে দরজায় কলিং বেল টিপছে, আর ঘরে আওয়াজ হচ্ছে। লিফটে চড়ে নীচে নামার সময় টুটুল বা রামকৃষ্ণবাবু এ রকম শব্দ শোনেন নি। তাঁরা উৎকর্ণ হলেন।

শব্দ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই লিফট ধীরে ধীরে থেমে গেল। যেখানে থামল, তার সামনেই প্রশস্ত পথ। লিফট-এ যে দুজন বেঁটে লোক ছিল, তারা টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে লিফট থেকে নামতে ইঙ্গিত করল। তাদের ইশারা অনুসারে তাঁরা লিফট থেকে নেমে সোজা হাঁটতে লাগল। একটু পরেই লক্ষ্য করল যে বিরাট প্রাসাদটার

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দুজনে।

প্রাসাদ থেকে বেরুবার পথ একটা নয়, হয়ত আরও আছে।

প্রাসাদের দরজার কাছে যে দুজন বেঁটে মানুষ আগেই দাঁড়িয়েছিল—যাদের প্রাসাদের বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে টুটুল পাহারাদার ভেবেছিল—তারা টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুর কাছে এগিয়ে এল।

লিফট-এর একজন বেঁটে মানুষ পাহারাদার বেঁটে মানুষদের একজনের হাতে হাতঘড়ির মত টেপ রেকর্ড যন্ত্রটা দিয়ে দিল। তারপর তার সঙ্গীকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

তখন পাহারাদার বেঁটে মানুষরা টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে হাত নেড়ে তাদের অনুসরণ করে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেলেন সামনেই একটা গোল দু' চাকার গাড়ি রয়েছে।

গাড়িটার সামনের দিকে ইঞ্জিন, মোটর গাড়ির হর্নের মত একটা জিনিস ইঞ্জিনের একধারে লাগান রয়েছে। গাড়িটার চারদিক খোলা, উপরে কোন ঢাকনা নেই।

বেঁটে মানুষরা টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে উঠতে ইশারা করল।

তাঁরা ওঠা মাত্র বেঁটে মানুষরাও লাফিয়ে গাড়ির উপরে উঠে পা-এর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দুটো বোতাম টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল।

টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবু চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। তাঁদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা কোন ধারণাই করতে পারলেন না।

গাড়ি যত এগোচ্ছে, গতিও তত বেড়ে চলেছে। যেন ঝড়ের বেগে ছুটছে।

"দেখ টুটুল, ঐ দেখ"—হঠাৎ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন রামকৃষ্ণবাবু।

সামনেই স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পদার্থে গড়া এক বিরাট পাহাড়।

সেই পাহাড়ে আকাশে নীল আলো প্রতিফলিত হয়ে জ্যোতি বিকিরিত হচ্ছে।

"এটা কি স্যার হীরের পাহাড় ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল টুটুল।

"হতে পারে। অসম্ভব নয়। সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।" —উত্তর দিলেন রামকৃষ্ণবাবু।

কথাবার্তা চলতে চলতে গাড়িটা পাহাড়ের খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখন দেখা গেল পাহাড়ের একপাশে ছোট একটা বাড়ি। বাড়ির ছাদের উপর কয়েকটা চোঙ্গা লাগান। সেই সব চোঙ্গার ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

গাড়ি থামতেই বেঁটে লোক দুজন টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুর হাত ধরে নীচে নেমে পড়ল।

তারপর তাঁদের নিয়ে বাড়িটার ভিতরে ঢোকার জন্য প্রধান দরজার দিকে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে রামকৃষ্ণবাবু পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, পাহাড়টা সত্যি হীরে দিয়ে তৈরী। হীরের অনেক দাম। অথচ কোটি কোটি টাকার হীরে এখানে পাহাড় হয়ে পড়ে আছে।

টুটুলের অবশ্য সন্দেহ হল যে পাহাড়টা আসল হীরের নয়, তবে হীরের মতই কোন জিনিসের তৈরী। সে পাহাড়ের গা থেকে একটা হীরের নুড়ি কুড়িয়ে পকেটে রাখল।

অমনি বেঁটে মানুষরা তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠল। মনে হল, তারা যেন টুটুলকে ধমকাচ্ছে।

টুটুল ভয় পেয়ে নুড়িটা পাহাড়ের গায়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

একটু পরেই বেঁটে মানুষ দুজন টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে নিয়ে পাহাড়ের কাছের সেই ছোট বাড়িটার ভিতরে ঢুকল।

আট

একজন বেঁটে মানুষ ঘরের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। তাকে বোধ হয় নতুন অতিথিদের আগমন-সংবাদ আগেই জানান হয়েছিল।

নতুন বেঁটে লোকটির হাতে টুটুল ও রামকৃষ্ণবাবুকে ছেড়ে দিয়ে আগের দুজন বেঁটে লোক আবার গাড়িতে উঠে কোথায় যেন চলে গেল।

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে টুটুল তো অবাক!

বিরাট হলঘর বাড়িটাকে বাইরে থেকে ছোট মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলে ছোট নয়।

হলঘরটা প্রায় আধমাইল লম্বা। চওড়াও কম নয়। ঘরে নানা-রকম জিনিস রয়েছে। অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। এসব জিনিস টুটুল পৃথিবীতে কখনও দেখে নি।

সব জিনিসই ছোট ছোট। বোধ হয় আসল বড় জিনিসের অনুকরণে ছোট ছোট মডেল তৈরী করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণবাবু বেঁটে লোকটার সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে কি যেন কথাবার্তা বলছিলেন। লোকটা মাঝে মাঝে ছবি এঁকে তাঁকে কি যেন বোঝাচ্ছিল।

টুটুল একটা খেলনা এরোপ্লেন-এর মত জিনিস দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল। এরোপ্লেনটায় বোধহয় চাবি দেওয়া রয়েছে, সেটা নিজে থেকে ঘুরছে। সঙ্গে সঙ্গে তার চার পাশ থেকে :আলোর লাল নীল রেখা ছড়িয়ে পড়ছে।

টুটুল সেটা হাতে নিয়ে দেখবে কিনা ভাবছে, এমন সময় "ঘ-র-র-টু-টু" শব্দ শুনতে পেল। ফিরে দেখল বেঁটে লোকটা তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে কি যেন বলছে।

লোকটা এগিয়ে এসে সেই প্লেনটার পাখার একটা বোতাম টিপে থামিয়ে দিল। তারপর সেটা টুটুলের হাতে দিয়ে জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগল।

রামকৃষ্ণবাবুও টুটুলের কাছে এগিয়ে এলেন।

বেঁটে লোকটা রামকৃষ্ণবাবুকে প্লেনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল। তারপর সেটা আবার বোতাম টিপে চালু করে দিল। তারপর হাসি-মুখে বিদায় নেবার ভঙ্গীতে হাত নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "টুটুল, এখন এ বাড়ীতে আমরা দুজনই আছি। এ বাড়িটা কি বুঝতে পারছ?"

"না স্যার।"

"এটা একটা জাদুঘর। তবে আমাদের দেশে যেমন মৃত জিনিসের জাদুঘর হয় তেমন নয়। এটা হল জীবন্ত জাদুঘর অথবা প্রদর্শনী-ঘরও বলতে পার।"

"তার মানে?"

"বুঝলে না? এ বাড়িটার বিভিন্ন ঘরে এই নক্ষত্রে যা যা আছে, তার ছোট ছোট মডেল রয়েছে। এসব জিনিস দেখলে এই রাজ্য সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা করা যাবে। বেঁটে লোকটা সবকিছু দেখার জন্য আমাদের ছেড়ে গেল। পরে আবার আসবে। পরপর কয়েকটা ঘর রয়েছে, আর প্রতি ঘরেই রয়েছে নানা রকম জিনিস। চল ঘুরে ঘুরে দেখি।"

টুটুল বলল, "স্যার, এসব দেখে আমাদের কি লাভ?"

রামকৃষ্ণবাবু বললেন, "লাভ? মানুষ যত দেখে ততই শিখতে পারে। আমরা নানা বিষয়ে জানতে পারব। এর পর হয়ত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের হাত ধরে শিক্ষা দেওয়া হবে। তখনই এই দেখাশোনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। ঐ দেখ উড়ন্ত চাকীর মত একটা আকাশ-যান ডানদিকে রয়েছে। অদ্ভুত! চল, ওটা দেখি।"

রামকৃষ্ণবাবু এগিয়ে গেলেন, সঙ্গে টুটুলও।

সে লক্ষ্য করল, তার মাস্টারমশায় প্রতিটি জিনিস নেড়েচেড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগ দিয়ে একই জিনিস বারবার দেখতে টুটুলের ভাল লাগছিল না। পাশের ঘরটায় কি আছে, তা দেখারও আগ্রহ হচ্ছিল।

সে কিছুক্ষণ পরে বলল, "স্যার, এ ঘরে তো দেখছি শুধু স্থলপথ, জলপথ আর আকাশপথে যাতায়াতের যানবাহনের নানা রকম মডেল রয়েছে। পাশের ঘরটায় কি আছে দেখে আসি।"

রামকৃষ্ণবাবু কি যেন দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "যাও।"

টুটুল পাশের ঘরে গিয়ে দেখে, নানা রকম জীবজন্তুর মডেল রয়েছে। সরীসৃপই কত প্রকারের। বাঘ নয়, তবে বাঘের মত অথচ শিং আছে—এমন একটা জন্তুর মডেলও চোখে পড়ল। এই নক্ষত্রের দেশে উড়ন্ত যান থেকে নেমে ডাইনোসর নামে যে বিরাট জন্তু দেখেছিল, তারও ছোট মডেল রয়েছে।

ঘুরে ঘুরে টুটুল দেখছিল বটে কিন্তু কিছুই তার ভাল লাগছিল না। সে ভাবছিল এই অদ্ভুত দেশে এইসব বিচিত্র জীবজন্তু আর কুৎসিত বেঁটে লোকগুলোর সঙ্গে যদি সারাজীবন কাটাতে হয়, তবে তার থেকে দুঃখের আর কিছু নেই। এখানে যদি চিরকাল থাকতে হয় তা হলে মা-বাবা ভাই-বোন কারও সঙ্গে কোনকালেই আর দেখা হবে না। পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার হয়ত এ জীবনে কোন সুযোগই হবে না।

মাস্টারমশায় যাই বলুন, বেঁটে লোকগুলোকে মোটেই ভাল মানুষ বলে মনে হয় না। ওরা নিশ্চয় কোন খারাপ মতলবে তাকে পৃথিবী থেকে ধরে এনেছে। বেঁটে লোকগুলো চালাক। এখনও ওদের মতলব প্রকাশ করে নি। পরে নিশ্চয়ই ওদের অভিসন্ধি প্রকাশ পাবে। তখন আর বাঁচবার কোন পথই থাকবে না।

পাশের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখল টুটুল। মাস্টারমশায়

এখনও আগের ঘরের জিনিসই দেখছেন।

বিজ্ঞানের মাস্টারদের কৌতূহল বোধহয় অন্যদের থেকে বেশি। অনেক সময় নিয়ে এক একটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করছেন। নতুন কোন যন্ত্র আবিষ্কারের কথা ভাবছেন কিনা কে জানে ?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে টুটুল অন্য একটা ঘরের দিকে পা বাড়াল। ঘরের পর ঘর। এক এক ঘরে এক এক জিনিসের প্রদর্শনী।

টুটুল দেখছিল বটে কিন্তু কিছুই তার ভাল লাগছিল না। সে আরও কয়েকটা ঘর পেরিয়ে এ বাড়ি থেকে সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে যাবার কোন পথ আছে কিনা খুঁজতে লাগল।

শেষ ঘরটার দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে দেখতে পেল—সামনে নুড়ি ছড়ানো সরু রাস্তা। তারপরে এক বিশাল পর্বত আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে ওদিকে তাকাল টুটুল। না, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। মাস্টারমশায় রয়েছেন অন্য ঘরে।

এ বাড়িতে এত জিনিস, কিন্তু কোন পাহারাদার এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। বোধ হয় এ দেশের মানুষদের সুযোগ পেলে চুরি করার স্বভাব নেই, তাই জিনিসগুলো পাহারা দেবার জন্য লোক রাখা হয় নি।

কাছাকাছি কেউ নেই। কেউ পথ আটকে দাঁড়াবে না—পালাবার এমন সুযোগ আর হবে না।

টুটুল নুড়ি ছড়ানো সরু রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে অল্পক্ষণ পরেই সে পর্বতের কাছে পৌঁছে গেল।

পর্বতের চারপাশে ঘন জঙ্গল। পর্বতের মধ্যে মাঝে মাঝে বড় বড় গুহা রয়েছে। এখানকার পাথরের রঙ ধূসর। বড় বড় পাথরের চাঁই মাঝে মাঝে পর্বতের গা ঘেঁষে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। পর্বতে কিছুটা উঠে এদিক ওদিক দেখল টুটুল। তারপর কি মনে করে

জঙ্গলের গাছগাছড়ার ভিতর দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে যে কোন বন্যজন্তু থাকতে পারে, নানা প্রকারের সরীসৃপের হঠাৎ আক্রমণে সে যে প্রাণ হারাতে পারে, এসব তার খেয়াল রইল না।

সে কোথায় পালাচ্ছে, তা সে নিজেই জানে না। শুধু বেঁটে মানুষদের চোখের আড়ালে কোন নির্জন স্থানে যেতে পারবে ভেবেই সে বুঝি ছুটছে।

ছোটার সময় ছোট ছোট নুড়ি তার পায়ের ধাক্কায় গাছপালার মধ্যে ছিটকে পড়ছে।

যেতে যেতে সে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। তার মনে হল, কি একটা প্রাণী লাফ মেরে খুব তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল। প্রাণীটি কি কোন সরীসৃপ, না বাঘ বা সিংহের মত কোন পশু? তা সে ঠিক বুঝতে পারল না। শুধু মনে হল, যে প্রাণীই হোক, তার গা ঘন লোমে ঢাকা, লাফিয়ে লাফিয়ে চলাই বোধ হয় তার স্বভাব। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে সে চারপাশ লক্ষ্য করল। না, আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। জন্তুটা হয়ত তাকে কোন অপরিচিত ভয়ঙ্কর দু'পায়ের প্রাণী ভেবে লুকিয়ে পড়েছে। সে নিজেও কিছুটা ভীত।

কিন্তু ভয় পেয়ে থেমে থেকে লাভ নেই। এই জঙ্গলের শেষে হয়ত কোন খোলা জায়গা পাওয়া যাবে—সেখানে নিঃশ্বাস ফেলে হাঁফ ছাড়া যাবে! ছুটে নয়, এবার দ্রুত হেঁটেই এগোতে লাগল টুটুল।

তার মনে হল জন্তুটি তাকে যেন গাছের আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে এবং যে কোন মুহূর্তে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তার হাতে কোন অস্ত্র নেই। বন্দুক বা ভোজালি বা ছোরা কিছু নেই যা দিয়ে বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করা যায়।

ডুবন্ত মানুষ যেমন হাতের কাছে ঘাস পেলে তাই চেপে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে, টুটুলও তেমনই কয়েকটা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে নিল।

জন্তুটাকে দেখতে পেলেই নুড়ি ছুড়ে যাতে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

সে যত এগোচ্ছে, জন্তুটাও যেন ততই সরে এক গাছের আড়াল থেকে অন্য গাছের আড়ালে দ্রুতবেগে লুকিয়ে পড়ছে। কিংবা হয়ত হঠাৎ ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজছে।

টুটুল ইতস্ততঃ করল। সে একবার বাঁ দিকে আবার একটু পরে কি ভেবে ডান দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু বেশিদূর এগোন সম্ভব হল না।



যেন বনমানুষ আক্রমণ করতে আসছে।

এবার সে দেখতে পেল জন্তুটা আড়াল থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতে বড় বড় নখ, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি, গা ভর্তি লোম, মাথায় জটার মত এলোমেলো চুল—দু'পায়ে ভর দিয়ে যেন কোন বনমানুষ আক্রমণ করতেই আসছে।

টুটুল মুঠো ভর্তি নুড়ি ছুড়ে দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার

আগেই সে শুনতে পেল—“তুমি কে? তুমি কি পৃথিবীর মানুষ?”

পরিষ্কার মানুষেরই কণ্ঠস্বর।

সবিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল টুটুল।

“ভয় পেও না। আমিও মানুষ।”—বলতে বলতে সেই প্রাণী একেবারে টুটুলের সামনে এসে দাঁড়াল।

এবার টুটুল যাকে জন্তু ভেবেছিল তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল।

জন্তু নয়। মানুষই বটে। শরীরের সর্বত্র পাকা চুল। সাদা দাড়ি প্রায় নাভি পর্যন্ত লম্বা। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। মাথার চুল পাকিয়ে জট হয়ে গেছে। হাত আর পায়ের নখ লম্বা লম্বা। বোধ হয় বহু কাল চুল দাড়ি নখ প্রভৃতি কিছুই কাটা হয়নি। লোকটি বৃদ্ধ। চোখের চাহনি কেমন যেন ঘোলাটে।

টুটুল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, “আপনি কে? কোথা থেকে এখানে এলেন?”

বৃদ্ধ বললেন, “আমি এই পর্বতের এক গুহায় থাকি। তোমার মত অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে এখানে এসেছিলাম।”

“আপনি এখানে বাস করেন কেন? পর্বতের গুহায় এই জঙ্গলের পরিবেশে আছেন কি জন্য?”

“বেঁটে মানুষ যারা এখানকার বাসিন্দা, তারাই আমাকে এখানে নির্বাসন দিয়েছে।”

“নির্বাসন? কেন?”

“আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যে অন্যায় আমি করেছিলাম, তার জন্য বিচারে আমার নির্বাসন হয়। সেই থেকে আমি এখানেই আছি।”

“আপনি কি করেছিলেন?”

“সে সব অনেক কথা। কিন্তু তুমি এখানে একা কেন? ওই শয়তানগুলো তোমাকেও কি আমারই মত পর্বতে নির্বাসন দিল?”

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ বসে পড়লেন।

বোধ হয় তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না।

নয়

টুটুলও তার কাছে গিয়ে কি মনে করে বসল। তারপর বলল, "আমাকে কেউ নির্বাসন দেয় নি। আমি ওই বেঁটে মানুষদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য নিজেই এখানে পালিয়ে এসেছি। আপনার জীবনের কথা শুনবার খুব আগ্রহ হচ্ছে। আপনি কবে কি করে এই নক্ষত্রের দেশে এলেন, এখানে আসার পরই বা কি কি ঘটল, দয়া করে সব আমায় বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে?"

"শুনবে? কি হবে সে সব শুনে?"

"বলুন না।"

"তাহলে শোন। আমি যখন তোমার বয়সী ছিলাম, যখন স্কুল-এ পড়তাম তখন এই নক্ষত্রের দেশের বেঁটে লোকেরা আমাকে একটা উড়ন্ত যান-এ উঠিয়ে পৃথিবী থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল। সে সব বহুকাল আগেকার কথা।"

"তারপর?"

"তারপর এখানেই আমার জীবন কাটতে লাগল। এরা আমায় অনেক কিছু শেখাল, এদের ভাষা শিখলাম, নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শিখলাম, এমন কি ঐ যে উড়ন্ত যান, যেটার সাহায্যে এখান থেকে পৃথিবী বা অন্য গ্রহ-উপগ্রহে যাতায়াত করা যায়, সেই উড়ন্ত যান চালাতেও শিখে গেলাম।"

"বলেন কি! এদের উড়ন্ত যান চালিয়ে আপনি পৃথিবী পর্যন্ত যেতে পারেন?"

"পারব না কেন? বেঁটে লোকগুলোই আমাকে সব শিখিয়েছে। শুধু উড়ন্ত যান চালানো নয়, আরও অনেক বিষয়ে শিখতে শিখতে আমি কিশোর বালক থেকে যুবক হয়ে গেলাম। অনেক বছর কেটে গেল। সময় ভালই কাটছিল। আমার খাওয়া-পরা কোন কিছুরই

অভাব ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে পৃথিবীতে বাড়ির লোকদের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করত। সে ব্যাপারের সুযোগ মিলে যেত, কারণ এরা আমার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার আগেই আমি নিজেই নিজের সর্বনাশ করে বসলাম।"

অনেক কথা একসঙ্গে বলার ফলে বৃদ্ধ হাঁফাতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর পোশাকের ভিতর থেকে কি যেন একটা গাছের পাতা বের করে সেটা চিবিয়ে তার রস পান করল।

টুটুল বলল, "আপনার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ?

বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'না, না। কতকাল পরে একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। কতকাল কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি নি। কথা বলতে আমার ভালই লাগছে।"

"তাহলে বলুন। আপনি যে বলছিলেন নিজেই নিজের সর্বনাশ করলেন, এ কথার মানে কি ? তারপর কি হল ?"

"তারপর ? আমার দুর্ভাগ্য শুরু হল।"

"দুর্ভাগ্য কেন ? কি ঘটেছিল ? আপনি কি উড়ন্ত যান চালাতে গিয়ে হঠাৎ আঘাত পেয়েছিলেন ?"

"না না, সে সব কিছু নয়। আমার লোভই আমার সর্বনাশ করল।"

"কি রকম ?"

"তুমি এখানে আমার কাছে আসার আগে একটা হীরের পাহাড় দেখেছ কি ?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

"ওগুলো সত্যি হীরে নাকি ?"

"হ্যাঁ সত্যি হীরে। এমন কয়েকটা হীরের পাহাড় এই দেশে আছে। বোধহয় জান, হীরে খুব দামী জিনিস। এক খণ্ড হীরের দাম এক লাখ টাকা। আমি পৃথিবীর মানুষ। ঐ হীরের পাহাড়

দেখে আমার খুব লোভ হল। ভাবলাম, যদি অনেকটা হীরে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তাহলে বিরাট বড়লোক হয়ে যাব। হীরে বিক্রী করে আমার অগাধ ধনসম্পত্তি হবে। আমি খুব সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পৃথিবীতে দিন কাটাতে পারব। কথায় বলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমারও তাই হল। লোভ সামলাতে পারলাম না। একদিন বেঁটে মানুষরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন আমি নির্জন হীরের পাহাড় থেকে অসংখ্য হীরের টুকরো সংগ্রহ করলাম। তারপর সেগুলো নিয়ে চোরের মত একটা উড়ন্ত যান-এ উঠে সেটা চালিয়ে পৃথিবীর দিকে রওনা হলাম। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলাম না। বেঁটে লোকেরা এখানকার আর একটা উড়ন্ত যান নিয়ে আমাকে তাড়া করে ধরে ফেলল। আমি যে উড়ন্ত যান নিয়ে পালাচ্ছিলাম, তার চলার শব্দেই বোধহয় বেঁটে লোকগুলো সজাগ হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, ওরা আমাকে হীরে সমেত ধরে ফেলার পর আমার শাস্তির ব্যবস্থা করল। আর কয়েদীদের যেমন খেতে পরতে দেয়, আমাকেও তেমন দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু আমাকে ওরা আর কোন কাজে হাত দিতে দিল না, আর কিছুই শেখাল না। তারপর ক-ত-কা-ল কেটে গেছে। দেখতে দেখতে আমি বুড়ো হয়ে গেছি।"

বুড়োর কথা শুনে টুটুল কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর বলল, "আচ্ছা, এই বেঁটে লোকগুলো শাস্তি হিসাবে তো আপনাকে মেরে ফেলতে পারত।"

বুড়ো বলল, হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে ওরা আমাকে খুন করতে পারত কিন্তু নিজেদের স্বার্থেই তা করে নি।"

টুটুল বলল, "ওদের স্বার্থ? আপনাকে বাঁচিয়ে রেখে ওদের কি স্বার্থসিদ্ধি হল, ঠিক বুঝলাম না।"

"বুঝলে না তো? এই দেখ।"—বলে বুড়ো তার পোশাকের পকেটের ভিতর থেকে একটা হাতঘড়ির মত জিনিস অর্থাৎ ওদেশের টেপ রেকর্ডার বের করল। তারপর ঘড়ির চাবিটা ঘুরিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে টুটুল ও রামকৃষ্ণ প্রাসাদের ঘরে দাঁড়িয়ে যে সব কথাবার্তা বলেছিল, সেগুলো শোনা যেতে লাগল।

টুটুল তো অবাক। সে বলল, "এ জিনিসটা আপনার কাছে এল কি করে?"

বুড়ো বলল, "বেঁটে মানুষদের একজন দিয়ে গেছে। তোমরা কি কথাবার্তা বলেছ তা ওদের ভাষায় অনুবাদ করে জানিয়ে দিতে হবে। নির্বাসনের পর থেকে এটাই আমার কাজ। হাতে-নাতে কোন কাজ করি না বটে, কিন্তু এ কাজটা করতেই হয়। পৃথিবীর মানুষের ভাষা আমাকে ওদের বুঝিয়ে দিতে হয়।"

টুটুল বলল, "তাহলে আমরা, মানে আমি আর রামকৃষ্ণ স্যার ছাড়া আরও অন্য অনেক লোকও এই নক্ষত্রে আছে, তাই না?"

বুড়ো বলল, "না। তোমরা দু'জনই নতুন আগন্তুক। তোমরা আসার আগে এরা এদের টেপ-রেকর্ড পৃথিবীতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে রেখে দিত। পৃথবীর মানুষ জানতেও পারত না তাদের কথাবার্তার রেকর্ড হচ্ছে। কিছুদিন পরে বেঁটে লোকেরা সেই টেপ-রেকর্ড নিয়ে এই নক্ষত্রে ফিরে এসে আমাকে অনুবাদ করে দিতে আদেশ করত। আমি সব বুঝিয়ে দিতাম। এইভাবে এরা পৃথিবীর মতি-গতি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেছে।

"বেঁটে লোকগুলো তো দারুণ চালাক। আচ্ছা, ওরা আপনাকে কি কোনদিন ছাড়বে না? আপনার নির্বাসনের মেয়াদ কি কখনও শেষ হবে না?"

"আমার নির্বাসনের সময় তো কিছুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি মুক্ত। ইচ্ছে করেই এখানে থাকি। কারো সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না"

"আপনি যখন মুক্ত হয়েছেন তখন ইচ্ছে করলেই তো এখন পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারেন?"

"পারি কি বলছ! এই তো কিছুদিন আগেই গিয়েছিলাম কিন্তু

সেখানে থাকতে ইচ্ছে করল না। ফিরে চলে এলাম এই নক্ষত্রের দেশে।”

—“কেন!”

—“আমার বয়স এখন প্রায় দেড়শ বছর। এই নক্ষত্রের প্রাণীরা দীর্ঘজীবী। এখানে থাকার ফলে আমিও অনেক-কাল বেঁচে আছি। কিন্তু আমার চেহারা তো দেখছই। শুধু বুড়ো হয়েছি তাই নয়, চেহারা বোধহয় অনেকটা জন্তুর মত হয়ে গেছে। দীর্ঘকাল নির্বাসনে থেকে চেহারা আর ঠিক মানুষের মত নেই। এ ব্যাপারটা আগে আমার খেয়াল ছিল না। পৃথিবীতে গিয়ে খেয়াল হল।

আমি পৃথিবীতে নেমে যে বাড়িতে আগে বাস করতাম, সেটা খুঁজে বের করলাম। তারপর খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, আমার মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাই মারা গেছেন। যারা বাড়িতে ছিল, তারা আমাকে কেউ চিনতে পারল না। অনেকে আমাকে দেখে ভয় পেল, কেউ ভাবল, আমি বুঝি কোন প্রেতাত্মা। আমি তখন বললাম যে আমি এক নক্ষত্রের দেশে ছিলাম। বহুকাল সেখান থেকে পৃথিবীতে আসতে পারি নি কিন্তু কোন মানুষই আমার কথা বিশ্বাস করল না। ছোট ছেলেরা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। বয়স্ক লোকেরা জন্তু কিংবা পাগল অথবা প্রেতাত্মা ভেবে ইঁট, পাথর নিয়ে তাড়া করল।

তখন আমি ছুটতে ছুটতে উড়ন্ত যান-এ উঠে এখানেই ফিরে এলাম। এতকাল পরে পৃথিবীতে ফিরে সুখে-শান্তিতে বাস আর সম্ভব নয়, এ কথা বুঝতে পেরে চলে এসেছি। “পৃথিবীকে বড় ভালবাসতাম, তাই তাকে ছেড়ে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল কিন্তু আসতেই হল। পৃথিবীর লোক আমাকে চায় না।”

বুড়োর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমল করতে লাগল। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

টুটুলও নীরবে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বলল,

"আপনি পৃথিবী ছেড়ে আবাব ফিরে এলেন, আমি কিন্তু একবার পৃথিবীতে যেতে পারলে আর কখনই ফিরব না। পৃথিবীতে যাবার জন্য আমার প্রাণ আনচান করছে।"

বুড়ো বলল, "কেন? এই নক্ষত্রের দেশ কি তোমার ভাল লাগছে না?"

"না। একদম নয়। মনে হয় এখানে থাকতে হলে আমি দম আটকে মরে যাব। মা-বাবা-ভাই-বোনের জন্য সর্বদা মন কেমন করে। কিছু ভাল লাগে না।"

"তাই নাকি? প্রথম প্রথম ওরকম হয়। আমারও হ'ত। তারপর সব ভাল লাগবে। সত্যি কথা বলতে কি, এ জায়গা পৃথিবী থেকে অনেক ভাল। অনেক নতুন কিছু জানতে শিখতে পারবে। থেকে যাও, শেষ পর্যন্ত তোমার ভালই হবে।"

"আমি ভাল চাই না। আমি পৃথিবীতে যেতে চাই।"

"চাইলেই কি আর যেতে পারবে? বেঁটে লোকেরা তোমাকে যে উদ্দেশ্যে এখানে এনেছে, সে উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে তো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না।"

"বেঁটে লোকেরা আমায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবে না জানি। কিন্তু আপনি তো ইচ্ছে করলে আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারেন।"

"আমি?"

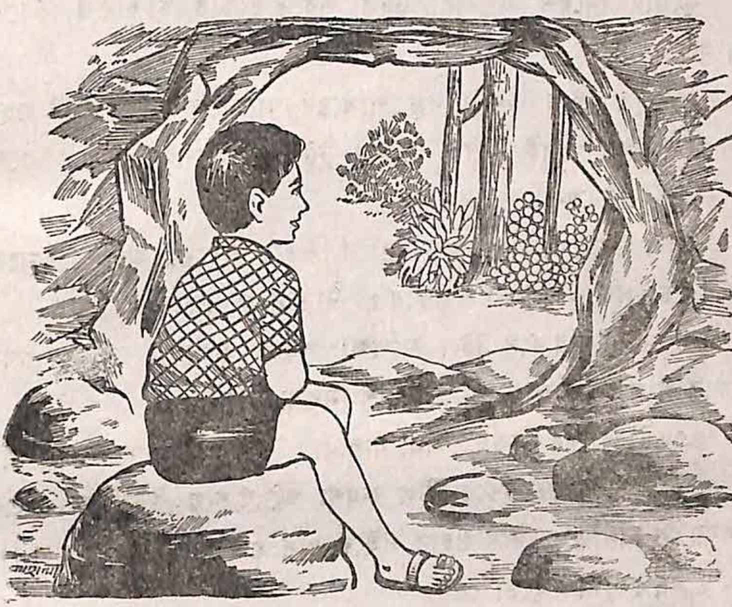
"হ্যাঁ, আপনি। এ রাজ্যের সব কিছুই তো আপনি জানেন। উড়ন্ত যান চালাতেও আপনি শিখেছেন। আমাকে তো আপনি ইচ্ছে করলেই পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে পারেন। দয়া করুন, আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে চলুন।"

"না না, সে হয় না। পৃথিবীতে গিয়ে কি করবে? সেখানে পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-মারামারি, কেউ কাউকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে না। পৃথিবী থেকে এ জায়গা অনেক ভাল। এখানে থেকে যাও। খাওয়া-পরা কোন কিছুরই অভাব থাকবে না। আমি যাচ্ছি।"

টুটুল হঠাৎ বুড়োর পা জড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, "ভগবানের দয়ায় যখন আপনার দেখা পেয়েছি তখন আপনাকে আম কিছুতেই ছাড়ব না। আপনাকে উড়ন্ত যান-এ আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যেতেই হবে।"

"আঃ, পা ছাড়, পা ছাড়। কি করছ? আমার পা-এর নখে তোমার হাতের মাংস কেটে যাবে। ছাড়। কি মুশকিল!"

টুটুল কিন্তু বুড়োর পা ছাড়ল না। কাঁদতে কাঁদতে বুড়োকে বার বার একই অনুরোধ করতে লাগল।



অনেকক্ষণ কাকুতি-মিনতি করার পর বুড়োর বোধহয় দয়া হল। সে বললো, "ঠিক আছে। আমি উড়ন্ত যান-এ তোমায় পৃথিবীতে পৌঁছে দেব। কাজটা গোপনে করতে হবে। বেঁটে লোকেরা জানতে পারলে তোমায় ছাড়বে না। আমারও বিপদ হতে পারে।"

টুটুল বলল, তাহলে আর দেরী করার দরকার নেই। চলুন, চলুন, এখনই দুজনে বেরিয়ে পড়ি। উড়ন্ত যান কোথায় আছে,

আপনি কি তা জানেন?”

“নিশ্চয়ই। এ রাজ্যের সব কিছুই আমি জানি। তবে এখুনিই বেরুব না। এখন বেরুলে হয়ত ধরা পড়ে যেতে পারি।”

“তাই বুঝি? তাহলে কি হবে?”

“কি আবার হবে। পরে সময়-সুযোগমত রওনা হব। এই পর্বতে অনেক গুহা আছে। এখন চল, একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। ভয় নেই। উপযুক্ত সময় হলেই আমি তোমায় ডাকব। তারপর দুজনে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।”

বুড়োর নির্দেশ অনুযায়ী টুটুল পর্বতে বুড়োর হাত ধরে উঠতে লাগল।

কিছুদূর গিয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে একটা ছোট গুহা চোখে পড়ল। সেই গুহার ভিতরে টুটুলকে অপেক্ষা করতে বলে বুড়ো কোথায় যেন চলে গেল।

টুটুল গুহায় ঢুকে পড়ল। গুহার ভিতরে বাইরের আলো ঢোকে না। চারিদিকে আবছা অন্ধকার। বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা।

গুহার ভিতরে বসে টুটুল অপেক্ষা করতে লাগল। বুড়ো কখন ফিরে আসবে কে জানে? চারপাশ নিস্তব্ধ, নিঝুম।

একটা পাখির ডাকও শোনা যায় না। সময় বয়ে যেতে লাগল।

অপেক্ষা করতে করতে টুটুল ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এক সময় সে হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাল।

না, কোথাও বুড়ো নেই।

হঠাৎ তার মনে হল, এমন তো হতে পারে যে বুড়ো হয়ত তাকে গুহার মধ্যে রেখে বেঁটে মানুষদের খবর দিতে গেছে। তাকে বেঁটে মানুষদের হাতে ধরিয়ে দেওয়াই হয়ত উদ্দেশ্য।

পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে বুড়ো হয়ত এবার তাকে বেঁটে মানুষদের হাতে সমর্পণ করবে।

অজানা অচেনা বীভৎস চেহারার একজন বুড়ো লোককে বিশ্বাস

করে হয়ত সে ভুলই করেছে। এখন বাঁচতে হলে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে ছুটে পালানোই হয়ত বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এসব কথা মনে হতেই টুটুল কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। কি করবে না করবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না।

একবার তার মনে হল, হয়ত তার ধারণা ভুল, বুড়ো মানুষ কখনও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। নানা কারণে তার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। তাই সে আবোলতাবোল ভাবছে।

আবার সে গুহার ভিতরে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কতক্ষণ গুহার ভিতরে অপেক্ষা করেছিল তা টুটুল নিজেই জানে না।

এক সময় গুহার বাইরে হিস্ হিস্-স-স শব্দ শুনে সে সচকিত হল।

তাড়াতাড়ি সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল প্রায় পনের ফুট লম্বা একটা সরীসৃপ পাথরের গা বেয়ে নিচে নামতে নামতে এগিয়ে যাচ্ছে। তার নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হিস্-স-স শব্দ হচ্ছে।

যে দিক দিয়ে সরীসৃপটা নামছে ঠিক তার বিপরীত দিক দিয়ে বুড়ো মানুষটা গুহার দিকে এগিয়ে আসছে।

বুড়ো টুটুলের কাছে এসে চাপাস্বরে বলল, "চল। আমাকে অনুসরন কর। আমি আগে যাচ্ছি।"

কথা শেষ করে বুড়ো পা বাড়াল।

টুটুল তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

পার্বত্য উঁচু নিচু জায়গা, আধো আলো আধো অন্ধকারময় জঙ্গল পেরিয়ে বুড়ো টুটুলকে নিয়ে এসে দাঁড়াল চকচকে মসৃণ এক রাস্তার উপরে।

রাস্তাটা সরু বুঝিবা কোন গোপন পথ।

বুড়ো টুটুলের দিকে ফিরে বলল, "চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নাকি?"

টুটুল হাঁফাচ্ছিল, তবু সে বলল, "না না, আমি ঠিক আছি। আর,

কতদূর যেতে হবে?"

বুড়ো বলল, "এই রাস্তা পেরিয়ে আরও কিছুদূর যেতে হবে। একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হত কিন্তু সময় নেই। বিশ্রাম নিতে গেলে হয়তো ধরা পড়ে যাব। এবার ছুটে চল।"

ছুটতে ছুটতে অনেকটা পথ অতিক্রম করে টুটুল সেই বুড়োর সঙ্গে একটা ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় পৌছল।

সেখানে একটা উড়ন্ত-যান দাঁড়িয়ে আছে।

এবার বুড়ো খুব ধীরে ধীরে প্রায় নিঃশব্দে পা টিপে টিপে টুটুলকে নিয়ে উড়ন্ত যানের কাছে পৌছল।

এক লাফে উড়ন্ত যানের উপর উঠে পড়ল বুড়ো। তারপর হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে টুটুলকে টেনে তুলল।

টুটুলের চোখে পড়ল উড়ন্ত যানের ভিতরে যেখানটায় সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই রয়েছে যন্ত্রমানুষ রোবট। আর গায়ে বিভিন্ন ধরণের বোতাম ও সুইচ। হাত পা চকচকে ধাতু দিয়ে তৈরী। মুখে তামাটে রঙের মুখোশ।

বুড়ো দ্রুত পায়ে যন্ত্র মানুষ রবোটের কাছে এগিয়ে গেল। তার গায়ের দুটো বোতাম পর পর টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত যানের ভিতরে একটা আলোর চাকা ঘুরতে লাগল। তার মধ্য থেকে বেগুনী ও লালরঙের আলো এক সঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং তীক্ষ্ণ শীসের মত আওয়াজ বেরুচ্ছে।

টুটুল কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ঝাঁকুনি দিয়ে উড়ন্ত যান দুরন্ত বেগে উপরের দিকে ছুটে চলল।

কিছুক্ষণ পরে সে বুঝতে পারল যন্ত্র মানুষ রোবটই উড়ন্ত যানটি চালাচ্ছে।

বুড়ো মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করছে।

রোবটের সামনে টেলিভিশনের স্ক্রীনের মত কি যেন টানানো। তার উপর দ্রুত ধাবমান মহাশূন্যের ছবি ফুটে উঠছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে সীমাহীন আকাশের অসংখ্য তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা তীব্র গতিতে উড়ে যাচ্ছে।

বুড়ো একদৃষ্টে যন্ত্র মানুষ রোবটের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করছিল। একবার সে পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে টুটুলের দিকে মৃদু হেসে তাকাল। ভাবখানা যেন—আর ভয় নেই, এবার আমরা ঠিক পথে চলেছি। নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাব।

আনন্দে টুটুলের লাফাতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু কাজটা অশোভন হবে ভেবে সে শুধু একগাল হেসে নিজের মনের খুশী খুশী ভাব প্রকাশ করল।

তারপর উড়ন্ত যানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

কি আশ্চর্য সুন্দর সব দৃশ্য! সৌর জগতের কথা সে ভূগোলে পড়েছে কিন্তু সেটা সে এমন অপরূপ দৃশ্যের জগৎ তা নিজের চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যায় না।

এক একটা তারাকে পৃথিবী থেকে কত ছেট দেখায়! কিন্তু এই উড়ন্ত যান থেকে তারাগুলো কত বড় মনে হয়। তাদের আলোও কত উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ।

পৃথিবী আর কতদূর কে জানে!

বেঁটে মানুষদের দেশে যাবার সময় মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে সবুজ গোলাকার ফুটবলের মত মনে হয়েছিল।

সেই সবুজ পৃথিবী নিশ্চয়ই আবার চোখে পড়বে।

মা এখন কি করছে? হঠাৎ তাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে।

মা তো জানে না, আজ তার ছেলে টুটুল বহুদূরের এক নক্ষত্রের দেশ থেকে তার কাছে ফিরে যাচ্ছে।

কি মজাই না হবে যখন সে নক্ষত্রের দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ছোট বোন টুকাইকে শোনাবে।

টুকাই তো কিছু বিশ্বাসই করতে চাইবে না।……

হঠাৎ উড়ন্ত যান কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর শব্দে টুটুলের ভাবনার স্রোত থেমে গেল।

চমকে উঠে সে এদিক ওদিক তাকাল।

বুড়ো যেন খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। কি যেন করছে। তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। যন্ত্র মানুষ রোবটের হাত বার ওঠানামা করছে।

টুটুল ব্যগ্র হয়ে বুড়োকে বলল, "কিসের বিকট শব্দ হল বলুন তো?"

বুড়ো বলল, "বেঁটে মানুষরা তাদের উড়ন্ত যানে চড়ে আমাদের ধরবার জন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। ওরা দূর থেকে ওদের অস্ত্র ছুড়ছে।

টুটুল বলল, "তাহলে কি আমাদের পালিয়ে আসার ব্যাপারটা বেঁটেলোকেরা এর মধ্যে জেনে ফেলেছে?

"নিশ্চয়ই ওরা খুব শক্তিশালী উড়ন্ত-যান নিয়ে ছুটে আসছে। আমিও কম যাব না। ধরা দেব না। কিছুতেই না। ওদের কাছে যা শিখেছি তা ওদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করব। তুমি তাড়াতাড়ি দেওয়ালে ঝুলান বেল্ট দিয়ে নিজেকে বেঁধে ফেল। আমি উড়ন্ত যানের গতি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি।"—বলে বুড়ো যন্ত্রমানুষ রোবটের হাঁটুর উপরের একটা সুইচ বারকয়েক টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে যানটি আরও তীব্রতর গতিতে ছুটতে লাগল।

টুটুল ইতিমধ্যে নিজেকে বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলল। না হলে যানটির অসাধারণ দুরন্ত গতির ফলে সে হয়ত ছিটকে বাইরে মহাশূন্যে অসীম আকাশের মধ্যে পড়ে যেত।

সময় কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে টুটুলের মনে হল তাদের উড়ন্ত যানটির গতি কমে আসছে এবং সেটা ক্রমশঃ নিচের দিকে নামছে।

যে আলোগুলো এতক্ষণ যানটির ভিতরে জ্বলছিল তাদের আলো

স্তিমিত হয়ে আসছে।

কৌতূহল বশে টুটুল জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

সত্যি অদূরে স্থল দেখা যাচ্ছে।

তাহলে তারা কি পৃথিবীতে ধীরে ধীরে নামছে?

উৎসাহে উঠে দাঁড়াল সে।

বেল্ট খুলে ফেলল।

তারপর বুড়োর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "আমরা কি পৃথিবীর কাছে পৌঁছে গেছি? পৃথিবীতে নামছি নাকি?"

বুড়ো বলল, "না, পৃথিবী এখনও দূরে। আমরা অন্য একটা গ্রহে নামছি।"

"কেন?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল টুটুল।

বুড়ো বলল, "এই গ্রহটিতে আমরা এখন লুকিয়ে থাকব। বেঁ মানুষদের যে উড়ন্ত যান আমাদের ধরতে আসছে সেটা আমা খুঁজে পাবে না। এবার আমরা স্থলে নামছি। তুমি নামার প্রস্তুত হও। এসে গেছি।"

কথা শেষ করে বুড়ো ছুটে এসে মেঝের উপর বসে ি ঘোরাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত যানের নিচের অংশ থেকে তিনটি ধাতু বেরিয়ে নোতুন গ্রহের ভূমি স্পর্শ করল। ফলে উড়ন্ত যান। শক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একে একে উড়ন্ত যানের সব আলো বুড়ো নিভিয়ে তীব্র দিয়ে টুটুল দেখল চারদিকে তরল অন্ধকার। আ জিনিসই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না।

হু হু করে বাতাস বইছে। কোথায় যেন রেলেক দেওয়া বাজার মত একটানা শব্দ হচ্ছে। টাই বুঝি

বুড়ো স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে টুটুলকে বলল "নিচে নামার দরকার নেই।মান।

হঠাৎ উড়ন্ত যান কেঁপে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর শব্দে টুটুলের ভাবনার স্রোত থেমে গেল।

চমকে উঠে সে এদিক ওদিক তাকাল।

বুড়ো যেন খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। কি যেন করছে। তার চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। যন্ত্র মানুষ রোবটের হাত বার ওঠানামা করছে।

টুটুল ব্যগ্র হয়ে বুড়োকে বলল, "কিসের বিকট শব্দ হল বলুন তো?"

বুড়ো বলল, "বেঁটে মানুষরা তাদের উড়ন্ত যানে চড়ে আমাদের ধরবার জন্য দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। ওরা দূর থেকে ওদের অস্ত্র ছুড়ছে।

টুটুল বলল, "তাহলে কি আমাদের পালিয়ে আসার ব্যাপারটা বেঁটেলোকেরা এর মধ্যে জেনে ফেলেছে?

"নিশ্চয়ই ওরা খুব শক্তিশালী উড়ন্ত-যান নিয়ে ছুটে আসছে। আমিও কম যাব না। ধরা দেব না। কিছুতেই না। ওদের কাছে যা শিখেছি তা ওদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করব। তুমি তাড়াতাড়ি দেওয়ালে ঝুলান বেল্ট দিয়ে নিজেকে বেঁধে ফেল। আমি উড়ন্ত যানের গতি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি।"—বলে বুড়ো যন্ত্রমানুষ রোবটের হাঁটুর উপরের একটা সুইচ বারকয়েক টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে যানটি আরও তীব্রতর গতিতে ছুটতে লাগল।

টুটুল ইতিমধ্যে নিজেকে বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলল। না হলে যানটির অসাধারণ দুরন্ত গতির ফলে সে হয়ত ছিটকে বাইরে মহাশূন্যে অসীম আকাশের মধ্যে পড়ে যেত।

সময় কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে টুটুলের মনে হল তাদের উড়ন্ত যানটির গতি কমে আসছে এবং সেটা ক্রমশঃ নিচের দিকে নামছে।

যে আলোগুলো এতক্ষণ যানটির ভিতরে জ্বলছিল তাদের আলো

স্তিমিত হয়ে আসছে।

কৌতূহল বশে টুটুল জানালা দিয়ে উঁকি দিল।

সত্যি অদূরে স্থল দেখা যাচ্ছে।

তাহলে তারা কি পৃথিবীতে ধীরে ধীরে নামছে ?

উৎসাহে উঠে দাঁড়াল সে।

বেল্ট খুলে ফেলল।

তারপর বুড়োর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, "অমেরা কি পৃথিবীর কাছে পৌঁছে গেছি ? পৃথিবীতে নামছি নাকি ?"

বুড়ো বলল,"না, পৃথিবী এখনও দূরে। আমরা অন্য একটা গ্রহে নামছি।"

"কেন ?"—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল টুটুল।

বুড়ো বলল, "এই গ্রহটিতে আমরা এখন লুকিয়ে থাকব। বেঁটে মানুষদের যে উড়ন্ত যান আমাদের ধরতে আসছে সেটা আমাদের খুঁজে পাবে না। এবার আমরা স্থলে নামছি। তুমি নামার জন্য প্রস্তুত হও। এসে গেছি।"

কথা শেষ করে বুড়ো ছুটে এসে মেঝের উপর বসে কি যেন ঘোরাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত যানের নিচের অংশ থেকে তিনটি ধাতু নির্মিত পা বেরিয়ে নোতুন গ্রহের ভূমি স্পর্শ করল। ফলে উড়ন্ত যানটি গ্রহটির শক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একে একে উড়ন্ত যানের সব আলো বুড়ো নিভিয়ে দিল। উঁকি দিয়ে টুটুল দেখল চারদিকে তরল অন্ধকার। আশেপাশের কোন জিনিসই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না।

হু হু করে বাতাস বইছে। কোথায় যেন রেলের ইঞ্জিনের ভোঁ বাজার মত একটানা শব্দ হচ্ছে।

বুড়ো স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। একটু পরে সে টুটুলকে বলল "নিচে নামার দরকার নেই। এই উড়ন্ত যানে

বসেই আমরা উপরে লক্ষ্য রাখব। বেঁটে মানুষদের যে উড়ন্ত যানটা আমাদের তাড়া করেছে সেটা এদিকেই আসছে। যদি এদিকে এসে আমাদের যানটা খুঁজে না পায় তা হলে হয়ত অন্যদিকে আমাদের খুঁজতে যাবে।

টুটুল বলল, "আমাদের উড়ন্ত যান খুব তাড়াতাড়ি চলার ফলে বেঁটে লোকদের দৃষ্টির আড়ালে চলে এসেছে—তাই না?

বুড়ো বলল, "হ্যাঁ সেইজন্যেই তো যানটির গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তবে ওরা যদি একবার আমাদের ধরতে পারে তাহলে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না "

টুটুল কোন উত্তর দিল না। শুকনো মুখে অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই আকাশে তীব্র শীসের মত শব্দ শোনা গেল।

টুটুল লক্ষ্য করল বেঁটে মানুষের উড়ন্ত যান প্রচণ্ড বেগে নোতুন -হটার উপরের আকাশের দিকেই ছুটে আসছে।

বুড়ো হাতে দূরবীনের মত কি একটা যন্ত্র নিয়ে সেদিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

বেঁটে মানুষদের উড়ন্ত যান গ্রহের উপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

তারপর সেটা এক জায়গায় বৃত্তাকারে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল।

টুটুল বুঝতে পারল বেঁটে লোকেরা বুড়োর যানটি খুজে না পেয়ে ঘুরে ঘুরে চারদিকে দেখছে।

এখনই হয়ত যে গ্রহে তারা লুকিয়ে রয়েছে সেখানে নেমে আসবে।

টুটুলের চোখের পলক পড়ছিল না। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে বেঁটে লোকদের উড়ন্ত যানের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বেঁটে লোকদের উড়ন্ত যান আবার পেছনে ফিরে গেল।

গ্রহটির উপরের আকাশের কাছাকাছি এসে ডান দিকের আকাশের

দিকে তীব্র গতিতে উড়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই সেটা একেবারে দৃষ্টি পথের বাইরে অদৃশ্য হল।

টুটুল বুড়োর দিকে তকোল।

বুড়ো তখনও দূরবীনের মত যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো চোখ থেকে যন্ত্রটা নামাল।

হাসিমুখে টুটুলের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "বেঁটে মানুষেরা আমাদের সন্ধান না পেয়ে অন্যদিকে খুঁজতে গেছে। এই সুযোগে এবার আমাদের পৃথিবীর দিকে পালাতে হবে। এক মূহূর্ত সময় নষ্ট করলে চলবে না।"

টুটুল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বুড়ো তাকে বাধা দিয়ে আবার বলল, "কোন কথা নয়। দেওয়ালের ঝুলন্ত বেল্ট দিয়ে আবার নিজেকে বেঁধে নাও। এবার ফুল স্পীডে যানটা চালাব।"

কথা শেষ করে বুড়ো মেঝের উপর বসে চাকার মত একটা জিনিস ঘুরিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত যানের নিচের অংশ থেকে যে তিনটি ধাতু নির্মিত পা বেরিয়ে নোতুন গ্রহের ভূমি স্পর্শ করেছিল সে পা তিনটি উড়ন্ত যানের ভিতরে চলে এল।

তারপর বুড়ো ছুটে গিয়ে যন্ত্রমানুষ রোবটের কাছে গিয়ে বসল। রোবটের গায়ের কয়েকটা বোতাম টিপে দিল।

পলকে উড়ন্ত যান উপরে বহুদূরে উঠে উত্তর আকাশের দিকে তীব্র গতিতে উড়ে চলল।

টুটুল জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল।

তারার আলোয় আলোকিত অনন্ত আকাশ। তারার চুমকি দেওয়া নীলাম্বরী শাড়ী, যা তার মাকে ব্যবহার করতে দেখেছে, সেটাই বুঝি সারা আকাশে কে বিছিয়ে রেখেছে।

ছোট ছোট গ্রহ উপগ্রহ মহা শূন্যে কেউ স্থির, কেউ চলমান।

তুরন্ত বেগে তারই মধ্যে পথ করে ছুটে চলেছে উড়ন্ত যান।

চলার পথের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে টুটুল যখন তন্ময় তখন হঠাৎ চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তার চোখে পড়ল।

সে বলল, "ঐ দেখুন, চাঁদ। কি সুন্দর জ্যোৎস্না। আমরা বোধ হয় পৃথিবীর কাছে এসে গেছি।"

বুড়ো চাঁদের দিকেই তাকিয়ে ছিল। সেদিকেই চোখ রেখে সে বলল, "না হে খোকা, পৃথিবীর আকাশে যে চাঁদ দেখ এটা সে চাঁদ নয়। শনি গ্রহের বলয়ের মধ্যেও একটা চাঁদ আছে। আমরা সেই চাঁদের আলোই দেখতে পাচ্ছি।"

"তাই নাকি? আমি তো জানতাম চাঁদ একটাই আর সেটা পৃথিবীর আকাশেই থাকে।"

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, "তোমার ধারণা ঠিক নয়। সৌরজগতে মোট পঁচিশটা চাঁদ আছে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য পনেরটা চাঁদের কথা জানে, অন্যগুলোর খোঁজ এখনও পায় নি।"

একটু থেমে বুড়ো কি যেন খুজতে লাগল।

তারপর বাঁ পাশ থেকে দূরবীনের মত একটা যন্ত্র হাতে তুলে বলল, "এই নাও। এটা খুব শক্তিশালী দুরবীন। এটা দিয়ে বহুদূরের জিনিস কাছে দেখা যায়। এটা চোখে লাগিয়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখ। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবে।"

টুটুল দূরবীনটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগল।

কতদূরের জিনিস কত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনন্ত আকাশের মধ্যে প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলাই না চলছে!

১০

কতক্ষণ টুটুল দূরবীনে চোখ দিয়ে বসেছিল তা তার নিজেরই খেয়াল ছিল না।

একসময় তার খেয়াল হল যে, সে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছে।

আনন্দে সে অধীর হয়ে উঠল।

চীৎকার করে আপন মনেই বলে উঠল, "এসে গেছি। পৃথিবীর কাছে এসে গেছি।"

বুড়ো ফিরে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই ধরেছ। দূরবীনে চোখ রেখে খেয়াল করে দেখ তোমাদের থাকবার জায়গার দিকেই যাচ্ছি কিনা। কোন এক গ্রামে তুমি বাস করতে বলেছিলে—তাই না?"

"হ্যা। তাই তো। চারপাশে পাহাড়, নদী, মাঝখানে আমাদের গ্রাম। নক্ষত্রের দেশ থেকে অনেক অনেক বেশি সুন্দর সেই পাহাড়ী গ্রাম। দূরবীনে এবার ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর খুব কাছে এসে গেছি তাই না?"

"হুঁ।"

কিছুক্ষণ পরেই টুটুল উত্তেজনায় দূরবীন নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—"ঐ যে আমাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। ছাদের উপর আমার মা দাঁড়িয়ে আছে। মা—মা গো—"

বুড়ো বলল, এখান থেকে ডাকলে তোমার মা শুনতে পাবেন না। বোস, উড়ন্ত যানটা এবার নামাচ্ছি। তোমাদের বাড়ির কাছে পাহাড়ের পাশে যে ফাঁকা মাঠ দেখা যাচ্ছে ওখানেই নামাই—কি বল?"

"হ্যা। সেই ভাল হবে। তাড়াতাড়ি করুন। মা এখনও ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন করছে…

লের কথা শেষ হতে না হতেই উড়ন্ত-যান বিদ্যুৎ বেগে নিচে নেমে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করল।

বুড়ো উঠে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে উড়ন্ত-যান থেকে নিচে নামার দরজাটা খুলে দিল।

টুটুল লাফিয়ে নিচে নেমেই বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল।

কিছু দূর গিয়ে কি মনে করে সে থমকে দাঁড়াল। পেছনে ফিরে দেখল, বুড়ো উড়ন্তযানের কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

সে বুড়োর কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "এ কি! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলুন।"

বুড়ো বলল, "কোথায় যাব?"

"আমাদের বাড়িতে চলুন।"

"তুমি একাই যাও। আমি বরং আবার নক্ষত্রের দেশে ফিরে যাই।"

"না। তা কখনই হতে পারে না। আপনাকে আমাদের বাড়িতে যেতেই হবে"—বলে টুটুল বুড়োর হাত ধরে টানতে লাগল।

বুড়ো বলল, "আমাকে দেখে তোমার বাড়ির লোকেরা হয়ত ভয় পেয়ে যাবে। আমার চেহারা এখনও তো জন্তুর মত। গা ভর্তি লোম, হাতে পায়ে বড় বড় নখ। দাড়ি গোঁফে মুখ তো প্রায় ঢেকে রয়েছে। তুমি একাই তোমার মার কাছে ফিরে যাও।"

টুটুল বলল, "আপনি আমায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। আপনাকে একা ফেলে আমি যাব না। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে। কিছু ভাববেন না, আমি সবাইকে আপনার কথা বুঝিয়ে বলব। চলুন। তাড়াতাড়ি চলুন। মাকে দেখার জন্য মন ছটফট করছে। চলুন, আমার সঙ্গে চলুন।"

টুটুলের অনুনয় বিনয়ে শেষ পর্যন্ত বুড়ো রাজী হল। সে টুটুলের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

"মা—মাগো—আমি এসেছি"—বলতে বলতে টুটুল দ্রুতপায়ে বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

টুটুলের মা তখনও বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিলেন। হঠাৎ ছেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন।

ছাদের কার্নিশ দিয়ে গলা বাড়িয়ে টুটুলকে দেখতে পেয়ে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে বাড়ির দরজার দিকে ছুটলেন।

টুটুল ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে।

মাকে দেখা মাত্র সে বুড়োর হাত ছেড়ে দিয়ে মার বুকে ঝাপিয়ে পড়ল।

"টুটুল রে—এতকাল তুই কোথায় ছিলি রে"—বলে কাঁদতে কাঁদতে মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

একটু পরেই বুড়োর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি সভয়ে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে বাড়ির ভিতরে ঢোকার জন্য পা বাড়ালেন।

টুটুল বুড়োর দিকে দেখিয়ে মাকে বলল, "ওনাকে বাড়ির ভিতরে আসতে বল মা। এই বুড়ো মানুষটার দয়ায়ই আমি পৃথিবীতে তোমার কাছে ফিরতে পেরেছি। নইলে নক্ষত্রের দেশেই হয়ত চিরকাল থাকতে হোত।"

টুটুলের মা বললেন, "আমি তো তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ইনি কে? নক্ষত্রের দেশই বা কি?"

টুটুল বলল, "ঘরে চল। সব বলছি।"

একটু থেমে সে মাকে ছেড়ে বুড়োর হাত ধরে বলল, "চলুন। ভিতরে চলুন।"

বুড়োর হাত ধরে টুটুল বাড়িতে ঢুকল।

তার মাও তার সঙ্গে রইল।

টুটুলের বাবা বাইরে কোথায় যেন বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এলেন।

টুটুলকে দেখে তার আনন্দের সীমা রইল না কিন্তু বুড়োকে দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না ?

টুটুলের ছোট বোন তো বুড়োকে দেখে ভয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল।

১১

টুটুল বেনকে কোলে তুলে অনেক কষ্টে তার কান্না থামাল।

তারপর বাড়ির সকলের কাছে নক্ষত্রের দেশে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, বুড়োর জীবন-কাহিনী এবং কি ভাবে উড়ন্ত যানে চেপে তারা পালিয়ে এসেছে—সে সব কথা জানাল।

সব শেষে বুড়োকে দেখিয়ে আবার বলল, "এর দয়ায়ই আমি ফিরতে পেরেছি নইলে তোমরা আমায় কোন কালেই খুঁজে পেতে না।"

বুড়ো এতক্ষণ নীরবে বসেছিল।

টুটুলের বাবা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনার কাছে আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনি ছেলেকে বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস আপনি নক্ষত্রের দেশে ছিলেন তাই ছেলেকে ফিরে পেলাম।"

বুড়ো উঠে দাঁড়াল। আসতে আসতে বলল, "আমার কাজ শেষ হয়েছে। টুটুলকে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমায় বিদায় দিন। আমি আবার নক্ষত্রের দেশে ফিরে যাই।"

টুটুলের মা বললেন, "না আপনাকে আমরা যেতে দেবনা। টুটুলের ইচ্ছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আপনি আমাদের উপকার করেছেন। আপনার ঋণ কিছুটা শোধ দেবার সুযোগ দিন। আপনাকে আমরা ছাড়ব না।"

বুড়ো বলল, 'তুমি থাকতে বলছ কিন্তু আমি থাকলে তোমাদের

তো অসুবিধা হবে।"

"কেন?"

"আমি তো ঠিক মানুষের মত নই। দেখছ না আমার চেহারা—বড় বড় নখ, মাথায় জটা, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি। আমাকে দেখলে সবাই ভয় পাবে। গ্রামের লোকেরা ভাববে বুঝি কোন প্রেতাত্মা কিংবা কোন বন্যজন্তু তোমাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে।"

টুটুলের বাবা বললেন, "ও সব আপনি ভাববেন না। আপনাকে দেখতে যেমনই হোক, আসলে তো আপনি মানুষ। আপনার চুল দাড়ি, নখ, কেটে ফেলার ব্যবস্থা করছি। বাড়তি জিনিসগুলো কেটে ফেললে আপনাকে আবার মানুষের মতই দেখাবে।" বুড়ো বলল," কিন্তু—

তার কথা শেষ না হতেই টুটুলের মা বললেন, "কোন কিন্তু আমরা শুনব না। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতেই হবে।"

টুটুলও বলল, "হ্যা থাকতেই হবে। আমি আপনার কাছে নক্ষত্রের দেশে আপনি যা শিখেছিলেন তা শিখে নেব। তারপর বড় হয়ে উড়ন্ত যানে চড়ে নক্ষত্রের দেশ আক্রমণ করব। আমি আপনাকে কিছুতেই ফিরে যেতে দেব না।"

সকলের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বুড়ো টুটুলদের বাড়ীতে থাকতে রাজী হল।

গ্রামের নরসুন্দর এসে বুড়োর বড় বড় নখ, চুল, দাড়ি ইত্যাদি কেটে দিয়ে গেল।

তারপর তাকে সত্যি অনেকটা মানুষের মতই দেখতে লাগল।

সেদিন রাত্রে বাড়ীতে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হল, টুটুলের মা নিজে নানা সুস্বাদু খাবার রান্না করলেন।

কিন্তু বিপত্তি হল খাবার পরিবেশনের সময়।

বুড়োর সঙ্গে টুটুলের বাবাও খেতে বসেছিলেন।

বুড়োর ভাতের থালার একপাশে মাছ, মাংস, তরকারী প্রভৃতির রান্না করা খাবার বিভিন্ন বাটিতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন টুটুলের মা। আর

আর একপাশে রেখেছিলেন পায়েসের বাটি এবং কয়েকটি ডিসের উপর দই সন্দেস, রসগোল্লা ইত্যাদি।

কিন্তু বুড়ো কিছুই মুখে দিচ্ছিল না। শুধু খাবারের জিনিস গুলোর দিকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

টুটুলের মা বুড়োকে বললেন, কি হল? আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না। খান। আপনার জন্যই আমি নিজে সব কিছু রেঁধেছি।"

বুড়ো বলল, "তুমি তো অনেক রেঁধেছ কিন্তু আমি এত খাব কি করে! আমার তো বহুকাল এসব খাবার অভ্যাস নেই। নক্ষত্রের দেশে একটা ট্যাবলেট খেলেই বহুদিন আর খিদে পেত না। মাছ, মাংস, পায়েস এসব খেতে তো ভুলেই গেছি। এতকাল পরে এই বুড়ো বয়েসে এসব খেলে কি তাঁর সহ্য হবে। এত আমি খেতে পারব না।"

টুটুলের মা বললেন, "খুব পারবেন। আপনার জন্য এত কষ্ট করে রাঁধলাম, আপনি না খেলে আমি খুব দুঃখ পাব।"

খাবারগুলো দেখে বুড়োর খুব লোভ হচ্ছিল। সে পৃথিবীতে আসার সময় নক্ষত্র দেশের খাবার ট্যাবলেটও সঙ্গে আনে নি।

টুটুলের মা ও বাবা দুজনেই যখন তাকে খেতে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন তখন সে মাছ, মাংস পায়েস ইত্যাদি খেতে আরম্ভ করে দিল।

অনেকদিন পরে নানারকম সুস্বাদু খাবার খেতে তার ভালই লাগছিল। কিন্তু খাওয়া শেষ হবার পরই সে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে তার নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে পড়ল।

টুটুল তখনও শুতে যায় নি। তার ফিরে আসার খবর শুনে বন্ধু বান্ধবেরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে উৎসাহের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুদের শোনাচ্ছিল।

মা তাকে কয়েকবার খাবার জন্য ডাকতে এলেন। কিন্তু তার

খিদে না থাকায় সে গেল না।

বন্ধুরাও তাকে ছাড়তে চাইল না।

অনেকক্ষণ পরে বন্ধুরা যখন চলে গেল তখন সে মা-র কাছে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা তাকে খেতে বলায় সে জানাল তার পেট ভর্তি আছে, আগামীকাল যদি খিদে পায় তবে খাবে।

পরের দিন অনেক বেলায় টুটুলের ঘুম ভাঙ্গল। বিছানায় উঠে দেখল ঘরে কেউ নেই।

পাশের ঘর থেকে কিসের যেন হৈ চৈ এর শব্দ ভেসে আসছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে টুটুল পাশের ঘরের দিকে ছুটল।

গিয়ে দেখে ঘর ভর্তি লোক তার মা-বাবা এবং একজন ডাক্তার বুড়োর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাক্তারবাবু তার বুকে নল লাগিয়ে কি যেন পরীক্ষা করছেন।

টুটুলের মা টুটুলকে গতকালই শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে সে যেন বুড়োকে দাদু বলে ডাকে। টুটুল বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, দাদুর কি হয়েছে?"

"শরীর ভাল নেই। চুপ কর। ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন"

—বললেন টুটুলের বাবা।

টুটুল আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

একটু পরে ডাক্তারবাবু টুটুলের বাবাকে বললেন, "অবস্থা সুবিধের নয়। আপনার কাছে এর বিষয়ে যা শুনেছি তাতে মনে হয় এই পৃথিবীর জলবায়ু এবং নতুন পরিবেশ বোধহয় এই বুড়ো লোকটির সহ্য হচ্ছে না। বহুকাল উনি তো অন্য জায়গায় ছিলেন তাই এখানকার পরিবেশের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তাছাড়া বয়সও মনে হয় অনেক হয়েছে। যাই হোক, ওষুধ পথ্য লিখে দিচ্ছি, চেষ্টা করে দেখা যাক।

ডাক্তার কথা শেষ করে নিজের প্যাডে খস খস করে কি সব লিখলেন তারপর টুটুলের বাবার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টুটুল বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, "দাদু, ও দাদু তোমার কি হয়েছে ?

বুড়ো চোখ খুলে একবার তাকাল। টুটুলের পিঠের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল, যেন তাকে আদর করছে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে অস্ফুষ্ট গোঙ্গানির শব্দ ছাড়া আর কিছুই বেরুল না। কি যেন বলতে গিয়েও যেন বলতে পারল না।

টুটুলের পিঠের উপর রাখা বুড়োর হাত হঠাৎ ধপাস করে বিছানার উপর পড়ে নিশ্চল হয়ে রইল।

টুটুলের মা আর্তনাদ করে উঠলেন। টুটুল বার কয়েক "দাদু-দাদু" বলে চীৎকার করে ডাকল কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিল না।